দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভারতের সভাপতিত্বে সফল জি-২০ সম্মেলন
এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ
— পৃঃ ২৩

ভারত : যে নামটি যাবতীয় পরিচয় বহন করে এসেছে— পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।। ৭ আশ্বিন - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ৭ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৫ সেপ্টেম্বর - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

অভিষেক আটক ইন্দ্রিয়সুখ না রাজনৈতিক প্রয়োজন? অবোধের গোবধে আনন্দ ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বিশ্বকর্মা আসেন যান, পশ্চিমবঙ্গে থাকেন না ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

এক দেশ এক ভোটের সঙ্গে এক ধাপ এগিয়ে থাকার ধারণাটিকেই একীভূত করা হচ্ছে ◻ আর. জগন্নাথন ◻ ৮

খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নিয়ে ভারতের কড়া অবস্থান ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

ভারত : যে নামটি যাবতীয় পরিচয় বহন করে এসেছে ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ১১

অস্তমিত ইন্ডিয়ায় ভারতের সূর্যোদয় ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১৩

দুটি নয়, একটিই নাম—ভারত ◻ বরুণ মণ্ডল ◻ ১৫

অনাদি অতীত থেকে এই দেশের নাম ভারত ◻ ড. কুশল সেন ◻ ১৭

ইন্ডিয়া না ভারত বিতর্কের প্রয়োজন নেই ◻ তথাগত রায় ◻ ১৮

ভারতের সভাপতিত্বে সফল জি-২০ সম্মেলনে এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ ◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ২৩

জি-২০ সম্মেলন নতুন শতাব্দীর পথে ভারত ◻ দীপ্তাস্য যশ ◻ ২৬

ওই মহামানব আসে ◻ রবিব্রত ঘোষ ◻ ৩১

পাকিস্তানের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করছেন মা দুর্গা ◻ হীরক কর ◻ ৩৩

জি-২০ সম্মেলন : স্বাধীন ভারতের একটি যুগান্তকারী ঘটনা ◻ ড. সুতনু সামন্ত ◻ ৩৬

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিরিখে এবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘কবিগুরুর শান্তিনিকেতন’ ◻ তিলক সেনগুপ্ত ◻ ৩৮

অরবিন্দ মুখার্জি আড়াই বিঘা জমি শান্তিনিকেতনকে দান করলেন ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৩

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন এবং ভারতের বিদেশ নীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ : একটি পর্যালোচনা ◻ বিমলশঙ্কর নন্দ ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২ অক্টোবর,
২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২ অক্টোবর,
২০২৩

হিন্দুধর্মের বিরোধিতা কেন?

হিন্দুধর্ম মানে ভারত আর ভারত মানেই হিন্দুধর্ম। ঋষি অরবিন্দের কথায় হিন্দুধর্মই ভারতের জাতীয়তা। ভারত থেকে সেই হিন্দুধর্মকেই শেষ করতে উঠেপড়ে লেগেছে ভারতেরই রাজনৈতিক বিরোধীরা।

কেন তাদের এই হিন্দুধর্ম বিদ্বেষ?

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই 'কেন'র উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবেন বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পুনরায় বিশ্বগুরু হইবার পথে ভারত

বহু বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। ইহা সত্যি যে স্বামীজীর এই কথা বাস্তব হইতে চলিয়াছে। বিশ্বের কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে বর্তমান ভারত। সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনে তাহারই প্রতিফলন অনুভব করিল বিশ্ববাসী। স্বামীজী বলিয়াছিলেন নূতন ভারত উঠিবে শান্তি ও প্রেমের বাণী সম্বল করিয়া। এই সম্মেলনে যুদ্ধরত রাশিয়া ও ইউক্রেনকে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত ঐকমত্যে সম্মত করিয়াছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ইহাও নিশ্চয় স্বামীজীর আশীর্বাদেই সম্ভব হইয়াছে। নূতন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে সমগ্র বিশ্ব নূতনভাবে ভারতকে অনুভব করিয়াছে। ভারতের সভাপতিত্বে এই বৈঠকের মূল ভাব ছিল 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার। ভারতের আতিথ্যে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন। বিমানবন্দরেই আগত প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে ভারতীয় সংস্কৃতির ঝলক প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা ভারতীয় পোশাক পরিধান করিয়াছেন। ভারতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক এবং তাঁহার সহধর্মিণী ভারতে পদার্পণ করিয়াই মন্দির দর্শন করিয়াছেন। পূজা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তিনি একজন গর্বিত হিন্দু। ভারতের সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানগণ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহাকে বিশ্বনেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সহিত সেলফি পর্যন্ত লইয়াছেন।

সমগ্র বিশ্ব এক পরিবার— ভারত সংস্কৃতির এই শাশ্বত বাক্যটি মাথায় রাখিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী আফ্রিকান ইউনিয়নকেও জি-২০ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার জন্যও আগত রাষ্ট্রপ্রধানগণ নরেন্দ্র মোদীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। এই সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভারতের আর একটি লক্ষ্য ছিল, বিশ্বে চীনের আগ্রাসন বন্ধ করা। তাহাতেও ভারত সফল হইয়াছে। সম্মেলনে ঐতিহাসিক মউ স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তাহাতে ভারত হইতে মধ্যপ্রাচ্য হইয়া সরাসরি ইউরোপ পর্যন্ত করিডোর হইবার কথা রহিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করিয়াছেন, এই চুক্তির ফলে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরাপের অর্থনীতি অধিকতর সমৃদ্ধ হইবে। ইহা ছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের সহিত ১৪টিরও বেশি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা এবং তাহার নিরাকরণের বিষয়ে সকলেই ঐকমত্য হইয়াছেন। নিকট প্রতিবেশী দেশ হিসাবে যেইরূপ শেখ হাসিনার সহিত চুক্তি হইয়াছে, সেইরূপ বাইডেনের সহিতও আলোচনা হইয়াছে জেট ইঞ্জিন, আধুনিক ড্রোন প্রযুক্তি, ফাইভ ও সিক্স জি নেটওয়ার্ক সিস্টেম লইয়া। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, এই সম্মেলনে সর্বপ্রকারে ভারতের কূটনৈতিক জয় হইয়াছে।

বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানরা নরেন্দ্র মোদীকে বিশ্বনেতা স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়া এই সম্মেলনকে সম্পূর্ণ সফল বলিয়া উল্লেখ করিলেও ভারতেরই বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করিয়া কটাক্ষ করিতে ক্লান্ত হইতেছেন না। তাহাদের গাত্রদাহের কারণ হইল, এই সম্মেলনে সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে ভারতকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাতে তাহারা দেশের নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে বলিয়া চিৎকার করিতে শুরু করিয়াছেন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বিশ্বের সম্মুখে ভারতকে ভারত হিসাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাতেই তাহারা গেল গেল রব তুলিয়াছেন। তাহাদের অভিযোগ, এই সম্মেলনকে সামনে রাখিয়া নরেন্দ্র মোদী দেশকে হিন্দুরাষ্ট্র করিয়া ফেলিয়াছেন। শতাব্দীপ্রাচীন মৃতপ্রায় দলটির এক নেতা 'ভারতমাতা' শব্দটিকে অসংসদীয় আখ্যা দিয়াছেন। আসলে, বিশ্বের দরবারে ভারতের অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠাকে তাহারা সহ্য করিতে পারিতেছেন না, ইহা খুবই দুঃখের বিষয়। ভারত পুনরায় বিশ্বগুরু হইয়া উঠিবে, ইহা ভারতেরই বিধিলিপি। সদ্য অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে ভারতের বিশ্বগুরু হইবার প্রমাণ অনেকটাই উন্মোচিত হইল।

সুভাষিতম্

গৌরবং প্রাপ্যতে দানাৎ ন তু বিত্তস্য সঞ্চয়াৎ।

স্থিতিঃ উচ্চৈঃপয়োদানাং পয়োধীনাং অধঃস্থিতিঃ।।

দানেই গৌরব প্রাপ্ত হয়, বিত্ত সঞ্চয়ে নয়। জল দানকারী মেঘের স্থান উচ্চে কিন্তু জল সঞ্চয়কারী সমুদ্রের স্থান নীচে।

অভিষেক আটক ইন্দ্রিয়সুখ না রাজনৈতিক প্রয়োজন?

অবোধের গোবধে আনন্দ

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

যদি ভুল না জানি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ৭ নভেম্বর ১৯৮৭। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে রেখেছেন তাঁকে লোকসভা ভোটের আগেই আটক করা হতে পারে। অর্থাৎ আগামী ৬ মাসের মধ্যে অভিষেক গ্রেপ্তার হতে পারেন। কারণ মে/জুন ২০২৪-এর বদলে মার্চ/এপ্রিলে ভোট হতে পারে। অনেকের কাছে অভিষেকবাবুর যেন-তেন প্রকার আটক ইন্দ্রিয়সুখের শামিল। কেন তিনি আটক হবেন নির্দিষ্টভবে তারা জানেন না। বিষয়টি তদন্তকারী সংস্থাগুলির আওতাধীন। এটা কেবল তাদের ইচ্ছা। স্বাভাবিকভাবে তদন্তের অনেকটাই অজানা। অভিষেকের সংস্থার ডিরেক্টরদের সম্পত্তির খতিয়ান তদন্তকারী সংস্থাকে জমা দিতে বলেছে আদালত। তাতে তাঁর পিতা-মাতাও রয়েছে।

অভিষেকের আটক বা গ্রেপ্তারি নিয়ে সাধারণের ভাবটা খুব গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না, কারণ একটাই বিষোদ্গার শুনতে পাই। 'ওইটুকু ছেলের এত রোয়াবি সহ্য হয় না।'এই গণ উষ্মার জন্য তিনি নিজে দায়ী। যেমন দায়ী মমতা। পরিবারের ওপর আক্রমণ কিংবা ফাঁসিতে ঝুলে যাওয়ার মতো কিছু অবাস্তব দাবি আর কথা বলে মমতা ও অভিষেক তদন্ত প্রক্রিয়াকে এতটাই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে যে তাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছে। বারবার আদালতের কাছে রক্ষাকবচ চেয়ে অভিষেক নিজেকে অনেকটা দোষী প্রমাণ করে ফেলেছেন। অথচ খাতায়-কলমে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। কিছু অসংলগ্ন উল্লেখ ছাড়া। আর ঠিক এই কারণেই ইডি আদালতে জানিয়েছে তাঁর গ্রেপ্তারের বিষয়টি অবান্তর। তৃণমূল বিরোধী শিবিরের তাতে গোঁসা হওয়া স্বাভাবিক। মমতা তাঁদের জায়গায় থাকলে একই ব্যবহার করতেন।

২০০০ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকারের কাছে আইনশৃঙ্খলার অবনতি আর সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র জমা দিয়ে তার কোনো ফল না পাওয়ায় মমতা তাই করেছিলেন। ইডি, সিবিআই নিয়ে বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর হতাশাকে তাই মান্যতা দিতেই হবে। তার মানে এই নয় যে তদন্তকারীরা তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন বা উঁচু তলার রাজনৈতিক চাপে ভেঙে পড়েছে। এসব আজগুবি তত্ত্ব— অন্য নাম 'সেটিং'। সন্দেহ নেই অভিষেকবাবুর গ্রেপ্তার বা আটক এই মুহূর্তে রাজ্যের সবচাইতে আলোচিত বিষয়। ১৯ বা ২১ সেপ্টেম্বরের পর তা আরও গুরুত্ব পাবে। বিরোধীদের ধারণা রাজ্যে এলাকা ভিত্তিক ৩৫৫ ধারা জারি কিংবা অভিষেকবাবুর গ্রেপ্তারি ছাড়া মমতাকে ধাক্কা দেওয়া অসম্ভব। দু'টোই রাজনৈতিক ভাবে প্রয়োজন। তাতে অনেক সমস্যা মিটবে। মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। তবে আমার মনে হয় আটক বা গ্রেপ্তারির উপর বেশি গুরুত্ব না দেওয়াটাই রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি সমীচীন।

> **শীতকালে দেহ গরম রাখতে অনেকে গলা ছেড়ে বেসুরো গান করেন। তদন্তকারীদের বিরুদ্ধে অভিষেক তাই করছেন। তাতে যেমন গান হয় না। চীৎকার হয়। মিথ্যাও সত্য হয়ে যায় না। গলাবাজিতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা যায় না। অভিষেকের উপর তদন্তের জাঁতাকল চেপে বসেছে। তাই বেসুরো চীৎকার চিঁ চিঁ আওয়াজ হয়ে বের হচ্ছে।**

এটা ঠিক অনেকের কাছে মূল সমস্যা, অভিষেক কেন জেলের বাইরে? এটা অবান্তর চিন্তা। তদন্তকারীদের মতে গ্রেপ্তার তদন্তের অংশ। পুরো তদন্ত নয়। মনে হয় এই একমুখী ভাবনা এখানকার বিরোধীদের সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছে। রাজ্য জুড়ে সারাদিন কীর্তনের মতো বেজে চলেছে— 'পিসি-ভাইপো' চোর। অভিষেক বিরোধীদের কাছে সত্য কি? অভিষেক অপরাধী। আর অভিষেক ভক্তদের কাছে সত্য কি? অভিষেককে হয়রানি করা হচ্ছে। তিনি নির্দোষ। দুটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ফলে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। হচ্ছেও তাই।

অভিষেক নিজেও সেই ভুলের শিকার। ফলে সিবিআই আদালতে জানিয়েছে তিনি এক অলীক ভীতির রোগে আক্রান্ত--- 'পারসিভড প্যারানোইয়া'। শীতকালে দেহ গরম রাখতে অনেকে গলা ছেড়ে বেসুরো গান করেন। তদন্তকারীদের বিরুদ্ধে অভিষেক তাই করছেন। তাতে যেমন গান হয় না। চীৎকার হয়। মিথ্যাও সত্য হয়ে যায় না। গলাবাজিতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা যায় না। অভিষেকের উপর তদন্তের জাঁতাকল চেপে বসেছে। তাই বেসুরো চীৎকার চিঁ চিঁ আওয়াজ হয়ে বের হচ্ছে। কোনো পরিণত রাজনীতিক তা করেন না। যে সব অবোধের গোবধে আনন্দ তারাই তা করেন। এখন পর্যন্ত তিনি তার ব্যতিক্রম হয়ে উঠতে পারেননি। □

বিশ্বকর্মা আসেন যান, পশ্চিমবঙ্গে থাকেন না

শিল্পসন্ধানেষু দিদি,

'কোনও শিল্পই ছোটো নয়। তেলেভাজার দোকান দিয়েও জীবনে অনেক বড়ো হওয়া যায়।'

দিদি, এবার আপনার উক্তি দিয়েই চিঠি শুরু করলাম। এই চিঠি যখন লিখছি তখন আপনি পারিষদদের নিয়ে স্পেন দেশে। সেখান থেকে দুবাই হয়ে কলকাতায় ফিরবেন। আশা করছি অনেক শিল্প মানে শিল্পের প্রস্তাব নিয়ে। তবে একটা তো পেয়েই গিয়েছেন। বেহালার ছেলে সৌরভ গাঙ্গুলী শিল্প গড়বেন পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে। কিন্তু তার ঘোষণা হয়েছে সুদূর মাদ্রিদ শহরে। আসলে সৌরভদাদা একটা জিনিসই চেয়েছেন— দিদিকে যেন খালি হাতে ফিরতে না হয়। নাকের বদলে নরুন যেন জোটে।

কিন্তু দিদি আমার আশ্চর্য লাগছে কয়েক মাস আগেও যখন আপনি শালবনিতে গিয়ে বললেন, জিন্দালদের জমি ফিরিয়ে দেবেন তখনও এ সব কোনও কিছু বলেননি। জানতেন না! বিশ্বাস হয় না। আসলে আপনি চমকটা মাদ্রিদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। তবে আপনার সফর দেখেশুনে যা বুঝলাম, আপনি দুবাই ও স্পেনের পর্যটন শিল্পের কিছুটা উন্নতি করে এলেন। এর পরে অনেক বাঙ্গালিই যেতে চাইবে। আর যেটা বুঝলাম অদূর ভবিষ্যতেই এ রাজ্যের বইমেলায় এবং ফুটবলে স্পেনীয় বিনিয়োগ আসতে পারে। সেটা কেমন করে আমার অবশ্য মাথায় ঢুকছে না। সে আপনি ঠিক জানেন। বুঝিয়ে বলবেন ঠিক এক দিন।

আসলে দিদি আপনার থেকেই আমার শিল্প চেনা। আমি বুঝেছি ইন্ডাস্ট্রি আর শিল্পের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। সেই যে আপনি বুঝিয়েছিলেন, আঁকাজোকা, শিল্পকলাও এক ধরনের শিল্প। তারপরে বলেছিলেন কাঁথাশিল্পও এক রকমের শিল্প। তেলেভাজাও। বলেছিলেন, 'কোনও শিল্পই ছোটো নয়। তেলেভাজার দোকান দিয়েও জীবনে অনেক বড়ো হওয়া যায়।'

যদিও শিল্পপতি-ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদরা বারবারই বলে আসছেন, পশ্চিমবঙ্গে চাই উৎপাদন শিল্প। পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ। বেহাল অর্থনীতির মোড় ঘোরানোই হোক বা রাজ্যবাসীর রুটিরুজির বন্দোবস্ত করা, দুটির জন্যই নতুন কলকারখানা গড়া, বন্ধ কারখানার দরজা খোলা একান্ত জরুরি। আর আপনি বলেন, 'আমার পাড়ায় কয়েকটি তেলেভাজার দোকান আমি চিনি, যাঁরা তেলেভাজা বিক্রি করে চার-পাঁচ-দশতলা বাড়ি করেছেন। বড়ো ব্যবসাও করছেন। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়।' মিষ্টির দোকানের ব্যবসায়িক সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আপনার যুক্তি, 'এত যে লোকের সুগার হচ্ছে, কিন্তু মিষ্টি খাওয়া কি কমছে? দোকানের সব মিষ্টি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। দিনের শেষে কোনও মিষ্টিই নষ্ট হয় না। মিষ্টির দোকান করেও বড়ো হওয়া যায়।' কিন্তু দিদি, টিভি সিরিয়ালের ময়রা নিজের হাতযশে পরিবারের হাল ফেরাতে পারে হয়তো! কিন্তু গোটা রাজ্যের অর্থনীতি কি এতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে? না, আপনি যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই পারে।

আসলে দিদি আপনি শিল্পের চেয়ে শিল্পীদের ভালোবাসেন বেশি। আমার মনে আছে, একবার আপনি সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'শুধু কি কাঠের শিল্প, সিমেন্টের শিল্প, লোহার শিল্পই শিল্প?' জানিয়েছেন, আমার ভাবনায় যাত্রা-নাটক-সিনেমা-সংগীত সবই শিল্প এবং সেই শিল্পকেই আমি বেশি করে তুলে ধরবো'। এটা ঠিক দিদি, সংস্কৃতি-জগতের জন্য আপনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে 'কলকাতার রসগোল্লা' নাচ দেখেন, 'পাগলু থোড়া সা কর লে রোম্যান্স' 'কত যে সাগর নদী পেরিয়ে এলাম' উপভোগ করেন, গানের সঙ্গে ঘাড় নাড়েন। উঠতি টিভি-নায়িকাদের বাড়ি লক্ষ্মীপুজো, সন্তোষী মায়ের পুজোতেও অংশ নিতে যান কিন্তু বণিকসভার কোনও অনুষ্ঠানে বড়ো একটা দেখাই যায় না। গেলেও অতি দ্রুত চলে আসার চেষ্টা করেন। আমার মনে হয় আপনার বলার কিছু থাকে না।

আপনি যতটা দুর্গাপুজোর কার্নিভ্যাল নিয়ে ভাবেন, যত দুর্গার চক্ষুদান করেন তার তুলনায় আপনার বিশ্বকর্মাকে নিয়ে আগ্রহই নেই। ওই ফেসবুকে একটা পোস্ট। ব্যাস। আগে বিশ্বকর্মা পুজো বাঙ্গালির উৎসব ছিল। কলকারখানায় উৎসবের রেশ চলতো কয়েকদিন ধরে। এখন মূলত টোটোওয়ালদের উৎসব। এ রাজ্যে অবশ্য শ্রমিকও নেই। সবাই ভিন রাজ্যে চলে গিয়েছে।

শিল্প ও শিল্পী নিয়ে আপনার দু'রকম ভাবনার একটা উদাহরণ দেব। ২০১৪ সালের ঘটনা। আপনি উদ্বোধনী আসরে উপস্থিত থাকবেন বলে সিআইআই-এর শিল্প সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল টাউন হলে। ঘটনাচক্রে সেদিনই সুচিত্রা সেন মারা যান। আপনি আর আসতেই পারলেন না। সকাল থেকে সন্ধ্যা সুচিত্রার অন্ত্যেষ্টিতে ব্যস্ত থাকায় টাউন হলে যেতেই পারেননি। মোবাইল ফোন মারফত বক্তৃতা করেছিলেন। আর একটা দিন মনে করাব। হাওড়া স্টেশন থেকে বন্দেভারত ট্রেনের সূচনা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসার কথা। কিন্তু সকালেই মাতৃবিয়োগ। তিনি নিঃশব্দে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মিটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির। সশরীরে সম্ভব ছিল না, কিন্তু ভার্চুয়ালি কর্তব্যে অবিচল থেকেছেন।

না, দিদি। তুলনা করে আপনাকে ছোটো করিনি। অন্যায় নেবেন না। মনে এল তাই বলে ফেললাম। তবে এটা ঠিক যে, আপনার পাশে পাশে শাহরুখ, বিপাশা, দেব, রচনাদের দেখে দেখে বিশ্বকর্মা এ রাজ্যে আসেন, যান কিন্তু থাকেন না মোটেও। □

অতিথি কলম

এক দেশ এক ভোটের সঙ্গে এক ধাপ এগিয়ে থাকার ধারণাটিকেই একীভূত করা হচ্ছে

আর. জগন্নাথন

একটি দেশের নির্বাচন আলাদা আলাদা ভাবে নয়। দেশ যেন একই সঙ্গে নির্বাচনে যেতে পারে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এতে একটি সংশ্লিষ্ট বিন্দুর সংকেত জড়িত যা হলো একীভূত নির্বাচন থেকে উদ্ভূত উন্নত প্রশাসন ও সরকার পরিচালনা। কিন্তু এত বড়ো একটি পরিবর্তন ঘটাতে গেলে সব রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটি মতৈক্যের প্রয়োজন।

এই সূত্রে একটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য যে, কোনো একটি বিষয় একটি রাজনৈতিক দল পরিবর্তনের পরিসরে আনলেই যে কোনো বিরোধী দল তার প্রতিবাদ করবে। এক্ষেত্রে পরিবর্তনটির ভালো-মন্দ বিচার্য হবে না। সেই কারণেই কেন্দ্র সরকার লোকসভা, বিধানসভা ও স্থানীয় স্তরের নির্বাচন একসঙ্গে করার সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাবনা চিন্তার যে প্রস্তাব নিয়ে আসতে চাইছে, তার জন্যই বিরোধী দলগুলি এককাট্টা হয়ে মোদীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার বাসনায় তার বিরোধিতা করছে।

প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বিভিন্ন দলের সদস্য নিয়ে এ বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে নিয়ে যে কমিটি হয়েছে তা থেকে প্রতিবাদে কংগ্রেস বেরিয়ে গেছে। আট সদস্যের ঘোষিত প্যানেলে ভূতপূর্ব কংগ্রেস নেতা গোলাম নবি আজাদ, গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কয়েকজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সদস্য হয়েছেন। এখন বিরোধী দলের যদি সকলে বেরিয়ে যেতে থাকেন সেক্ষেত্রে কমিটি তার জৌলুষ ও গুরুত্ব খানিকটা হারাবে। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। এই কমিটির যে কোনো পরিবর্তনের পরামর্শ যদি আসে সেগুলি কিন্তু চলতি লোকসভার আয়ুষ্কালে আইনে পরিণত করা যাবে না। আর সেপ্টেম্বরের মধ্যপথে যে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে তাতে তো নয়ই। এছাড়া সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ এই বিলে এমন প্রচুর অংশও থাকবে যেগুলিতে বিভিন্ন রাজ্যের অনুমোদনও প্রয়োজন।

ওএনওপি আমাদের গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের পথে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। কখনই এটিকে ‘নিপাত যাক’ লিস্ট দিয়ে রাজনৈতিকভাবে ওএনওপি-কে খাটো বানিয়ে আমরা বড়ো ‘one up’ এই থিয়োরি খাড়া করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, আদৌ যদি ‘এক দেশ এক ভোট’ আইনত পাশও হয়, এর পেছনে বহু দলের সমর্থন দরকার পড়বে, বিশেষ করে যে সমস্ত দল এই চলতি সরকারের সঙ্গে যুক্ত নয়। এমন বড়ো ধরনের ও গভীর প্রভাবপূর্ণ রাজনৈতিক সংস্কার বহু দলীয় মতৈক্যের ভিত্তিতে তৈরি হয় শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে নয়। এই ONOP-র (one nation one Poll) অনেক গুণ— (১) এটি নির্বাচনের খরচ বিপুলভাবে কমাবে যেহেতু সবই এক সঙ্গে হবে। (২) এর ফলে সামগ্রিক প্রশাসনও উন্নত হবে, কেননা সরকার নির্দিষ্ট ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হলে মাঝপথে কোনো মধ্যবর্তী নির্বাচনের জন্য ভয়ার্ত হতে হবে না।

যাঁরা এই পন্থার বিরোধিতা করছেন তাঁদের মতের মধ্যে দুটি ‘যদি’ আছে— (১) যদি নির্বাচিত হওয়ার অনতিকালের মধ্যেই সরকারটির পতন হয় সেক্ষেত্রে কী কেন্দ্র, কী রাজ্য, কী পঞ্চায়েত যার পতন হবে সে কি অনির্বাচিত কোনো কর্তা-দ্বারা পরিচালিত হবে? ধরুণ রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল এ বিষয়ে অভিজ্ঞ উপদেষ্টামণ্ডলী নিযুক্ত করে তাদের কর্মধারায় প্রশাসন চালিয়ে নিয়ে যাবেন। দ্বিতীয়ত, সাংসদ বা বিধায়ক বা অন্য যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের কার্যকাল ও পদ কি নির্দিষ্ট সময় অবধি চলবে যখন ওএনওপি গৃহীত হবে আবার কোনো সরকারও পড়ে যাবে? একবার ভোটের তত্ত্বে নির্বাচিত কোনো একটি রাজ্য সরকারই যদি নির্ধারিত মেয়াদকালের আগে পড়ে যায় সেক্ষেত্রে এই ওএনওপি থিয়োরিকে এক দেশ দুটি ভোটে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনো জায়গায় সরকার পড়ে গেলে, মনে করা যাক ১ বছরের মাথায় পড়ে গেল, তাহলে অনির্বাচিত প্রতিনিধিরা আড়াই বছরের বেশি সরকার চালাতে পারবেন না, কেননা যদি ওএনওপি-কে একবার ভোটের বদলে আড়াইবছর অন্তর অর্থাৎ দুটি নির্বাচনে রূপান্তর করা যায়, যাতে অনির্বাচিতেরা অত দীর্ঘকাল প্রশাসন না চালায়।

আর একটি বিকল্প পথ এমন হতে পারে যে, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল একটি বহুদলীয় সরকার তৈরি করে অন্তর্বর্তী সময়টি সরকার চালাবার দায়িত্ব দেন। তৃতীয় একটি সমাধান এমন হতে পারে যে, কোনো সরকারকেই কোনোভাবেই ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যারা সরকার হটাচ্ছে তারা চালাবার মতো

বিকল্প সরকার প্রস্তুত করে বিচ্যুতির সমাধানে কাজে না নামবে। এটি সম্ভব না হলে পূর্ববর্তী সরকার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে চলবে যেন model code of conduct চালু আছে। অনেকে বলতেই পারেন এই ‘জোগাড়’ বা হাতেনাতে তুলে আনা চটজলদি সমাধান কখনই আসল সরকারের সমাধান হতে পারে না। কোনো সময় কোনো দল বা জোট সরকার যদি সংখ্যাধিক্য হারায় সেক্ষেত্রে সরকার ফেলে দিয়ে পুনর্নির্বাচনই একমাত্র রাস্তা। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে যদি কম খরচে আমরা একটি দায়িত্বপূর্ণ পরিচালকমণ্ডলী পাই তা গ্রহণ করা কি মহাঅন্যায়? পৃথিবীতে যেখানে সমস্যাযোগ্য বিষয়ের সমাধানের নিতান্ত অভাব, সেখানে কোনো পথ যদি আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে কোনো সত্যনিষ্ঠ পথ দেখায়, অন্তত মধ্যবর্তী সময়ের জন্য তাকে বাতিল করা কি উচিত?

অন্যদিকে আর একটি বিভ্রান্তি তোলা হচ্ছে ভোটারদের নিয়ে। তারা তো হকচকিয়ে যাবেন তিন ধরনের ভোট— লোকসভা, বিধানসভা ও পঞ্চায়েত একসঙ্গে দিতে গিয়ে। এর ফলে কোনো একটি দল বা তার জনপ্রিয় নেতা বাড়তি সুবিধে পেয়ে থাকে। এমনটা হতেও পারে কিন্তু সম্ভাবনা ক্ষীণ। নিশ্চয় জানেন অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশার নির্বাচন লোকসভার সঙ্গেই হয় কিন্তু ফলাফল এক দলের পক্ষে হয় না। একই সঙ্গে অনেক সময়ই মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে লোকসভা নির্বাচন ও বিধানসভা, পঞ্চায়েত বা পৌরসভায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফলাফল ভিন্ন হয়। আমরা তাদের এই ভাবে নির্দিষ্ট পছন্দ নির্ধারণ করার জন্য কোনো ধন্যবাদ বা কৃতিত্ব দিই না।

নতুন এক দেশ এক সময়ে ভোট হলে এই বিষয়টিই আর থাকবে না যদি কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় সংস্থাগুলির ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। সেক্ষেত্রে নির্বাচকমণ্ডলী স্বেচ্ছায় বেছে নেবে কে কেন্দ্রীয়ভাবে, কে রাজ্যগতভাবে আবার কে নিতান্তই পাড়াগত ভাবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে কাজ করবেন। সেই সময় ভোটারা পরিষ্কার হয়ে যাবেন তারা পছন্দের ক্ষেত্রে যে কোনো দলের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করবে এবং কোন ক্ষেত্রে— কেন্দ্রে, রাজ্যে না পঞ্চায়েতে? বর্তমানে যে সময় ব্যবধানে ভোটারকে ভোটকেন্দ্রে লাইন দিতে হয় (কম করে তিনবার, ৫ বছরের মধ্যে সরকার পড়ে গেলে আরও বেশিবার), এই সময় রাজনৈতিক দলগুলি বারবার অযথা কী প্রতিশ্রুতি বা দান ধ্যান তাৎক্ষণিক হলেও করা যায় সেই সুযোগটা নেয় যাতে ক্ষমতায় থাকা যায়। এর ফলে কেন্দ্র, রাজ্য বা সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই ব্যাপক রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। এই খরচগুলির সঙ্গে বহির্বিশ্ব থেকে অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ সব খরচের দাবি উঠে আসে, যেমন— ইউক্রেন যুদ্ধ (যেখানে বিপুল ভারতীয় ছাত্র আটকে ছিল), কোভিড মহামারী প্রভৃতি। বারবার নির্বাচনে ভোটারকে প্রলোভিত করতে যদি উপর্যুপরি অর্থদানের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী করতে হয় অন্তত বছরে তিনবার। সেক্ষেত্রে অর্থভাণ্ডার ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসবে। মনে রাখতে হবে, করদাতাদের টাকা দু'হাতে এভাবে ক্ষমতা দীর্ঘকরণ করতে খরচ করা একটি আইনসঙ্গত দুর্নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে শুধু গণতান্ত্রিক মোড়ককে বিক্রি হচ্ছে।

আমাদের দেশের গণতন্ত্র সুশাসনকে অত অবহেলা করতে পারে না। বিশেষ করে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা ‘প্রথমে কে পোস্ট পেরোবে’ নীতি চালু থাকায় যে কেউ ৩০-৩১ শতাংশ জনপ্রিয় ভোট পেলেই গদিতে বসে পড়তে পারে (উত্তর প্রদেশে ২০০৭, ২০১২)। জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে প্রশাসন চালানো কখনই গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো নয়।

অবশ্যই ওএনওপি-র বিরুদ্ধে একটি অত্যন্ত স্বচ্ছমানের যুক্তি খাড়া করা হচ্ছে যে এটি অত্যন্ত জটিল পন্থা। কিন্তু আমরা জিএসটি-র মতো অতি আধুনিক আধা রাজনৈতিক আইন লাগু করে অর্থনীতিকে কি শক্তিমান করে তুলিনি? ফল আসতে সময় লেগেছিল। ওএনওপি-ও একদিন জিএসটি যেমন ট্যাক্সের ক্ষেত্রে বিপুল সুবিধে করেছে তেমনই করবে। ওএনওপি আমাদের গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের পথে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। কখনই এটিকে ‘নিপাত যাক’ লিস্ট দিয়ে রাজনৈতিকভাবে ওএনওপি-কে খাটো বানিয়ে আমরা বড়ো ‘one up’ এই থিয়োরি খাড়া করতে পারি না।

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্দেশক)

শোকসংবাদ

মালদহ জেলার প্রাক্তন বজরং দল সংযোজক সন্তু ঘোষের মাতৃদেবী ভারতী ঘোষ গত ১০ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ রোগভোগের পর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা ও দুই নাতি রেখে গেছেন।

* * *

মালদহ নগরের স্বয়ংসেবক তথা মালদহ জেলার সহ জেলাকার্যবাহ নারায়ণ মণ্ডলের পিতৃদেব রাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল গত ১৫ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা, নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটির অগ্রিম বুকিঙের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা স্মারকগ্রন্থটি নিতে ইচ্ছুক অথচ অগ্রিম মূল্য জমা দিতে পারেননি তাদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা ৩৫০্ টাকার (মূল্য ৪০০্ টাকা) বিনিময়ে গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারেন।

বেলুড়মঠে পূজনীয় সরসঙ্ঘচালকজীর অনুষ্ঠানস্থলেও গ্রন্থটি ৩৫০্ টাকার বিনিময়ে বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে। — ব্যবস্থাপক

খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নিয়ে ভারতের কড়া অবস্থান

স্থগিত হলো বহু প্রতীক্ষিত ভারত- কানাডা বাণিজ্য-চুক্তি। এবছরের মে মাসে কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী মেরি এনজি এবং ভারতের বিদেশ-মন্ত্রকের মুখপাত্র পীযূষ গোয়েল এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন, যে তারা এ বছরের মধ্যেই তাদের দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বাড়াতে আশাবাদী। কিন্তু জি-২০ সম্মেলনে ভারত ও কানাডার মধ্যে খালিস্তান ইস্যু নিয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় আসন্ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা স্থগিত করেছে কানাডা। গত ১৫ সেপ্টেম্বর এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছেন কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী মেরি এনজি। এনজি-র ঘোষণার পরেই এক বিবৃতিতে একই তথ্য জানিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। চুক্তি বিলম্বের এবং আলোচনা স্থগিতের কোনো কারণ অবশ্য জানায়নি কানাডা। বার্তাসংস্থা আলজাজিরাকে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ১৫ সেপ্টেম্বর কানাডার বাণিজ্যমন্ত্রী মেরি এনজির মুখপাত্র শান্তি কসেন্টিনো বলেন, 'এই সময়ে আমরা ভারতে আসন্ন বাণিজ্য মিশন স্থগিত করছি।'

নয়াদিল্লিতে সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেদেশে খালিস্তানি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে কানাডা প্রশাসনকে দায়ী করার কয়েকদিন পরেই এমন ঘোষণা এল। একে দুই দেশের উত্তেজনাপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রতিফলন বলে মনে করছেন কূটনীতিজ্ঞরা। পর্যাপ্ত অবকাশ ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কেন আমন্ত্রণ জানাননি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন কানাডার কূটনীতিবিদরা। সূত্রের খবর, ট্রুডোর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সময় মোদী কানাডার খালিস্তানপন্থী শিখদের আন্দোলন নিয়ে ট্রুডোর নেতৃত্বাধীন সরকারের মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণকে 'তিরস্কার' হিসেবেই গ্রহণ করছে ট্রুডোর নেতৃত্বাধীন কানাডা সরকার বলে জানিয়েছে দেশটির প্রশাসনিক কর্তারা।

উল্লেখ্য, নিজেদের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করা এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করতে একটি চুক্তি করা নিয়ে কানাডা ও ভারতের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় ২০১০ সাল থেকে। মাঝে আলোচনার গতি স্তিমিত হলেও গত দু'তিন বছর ধরে ফের শুরু হয়েছিল আলোচনা। কিন্তু খালিস্তান-সংকট গোটা প্রক্রিয়াটিকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

কী এই খালিস্তান সংকট? এটা একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং এখনই একে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে আগামীদিনে তা দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট সংকট সৃষ্টি করবে। 'খালিস্তান' নামটি এসেছে পঞ্জাবী ভাষার শব্দ 'খালসা' থেকে, যার অর্থ 'পবিত্র'। তাই খালিস্তান শব্দটির আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ হলো 'পবিত্র ভুমি'। ১৬৯৯ সালে শিখ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগুরু গোবিন্দ সিংহ মুঘল শাসনকালে শিখদের জন্য পৃথক একটি দেশের দাবি তোলেন। সেই দেশের নাম তিনি দেন খালিস্তান।

গোবিন্দ সিংহের প্রস্তাবিত সেই এলাকার সীমানা ছিল ভারতের বর্তমান রাজধানী দিল্লি থেকে পাকিস্তানের লাহোর পর্যন্ত। এই এলাকার মধ্যে বর্তমান ভারতের তিনটি অঞ্চল— পঞ্জাব, হরিয়ানা ও দিল্লি নিয়ে খালিস্তান গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে কংগ্রেস-মুসলিম লিগের পাশাপাশি কিছু শিখও খালিস্তানের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। সেই আন্দোলন যদিও সফল হয়নি। তবে বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে ভারতে তীব্র হয়ে ওঠে খালিস্তান আন্দোলন। এমনকী এই আন্দোলনের জেরে নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে ১৯৮৪ সালে খুন হতে হয় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও।

সেইদিক দিয়ে শুধু ভারতেই নয়, বহির্বিশ্বের সর্বত্র খালিস্তানি আন্দোলনের বিষয়ে কড়া মনোভাব নিয়েছে ভারত। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এ ব্যাপারে যে ভারতের জিরো টলারেন্স নীতি তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে কানাডা ও ভারতের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। সেই ভিডিওটিতে দেখা যায়, কানাডার অন্টারিও প্রদেশের ব্রাম্পটন শহরে কুচকাওয়াজ করছেন এক দল শিখ তরুণ এবং সেই কুচকাওয়াজের থিম সাজানো হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে। এই ভিডিয়ো-চিত্র প্রকাশের পর কানাডাকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেয় ভারত। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, কানাডার সরকার ভারতের সেই সব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে, যারা নিয়মিত বিদেশে ভারতের কূটনীতিবিদ ও প্রবাসী ভারতীয়দের ওপর হামলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।'

জবাবে পালটা এক বিবৃতিতে কানাডার বিদেশ মন্ত্রকের থেকে বলা হয়, 'কানাডার সংবিধানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচির অধিকার স্বীকৃত। কোনো ব্যক্তি বা জনসমষ্টি যদি সাংবিধানিক শর্ত মেনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেন, সেক্ষেত্রে সরকার তাতে বাধা দিতে পারে না।' স্বাভাবিকভাবেই খালিস্তান ইস্যুতে কানাডার এই আপোশকামী মনোভাবের সঙ্গে সহমত হতে পারেনি ভারত। এই পরিস্থিতে কানাডা সরকার ভারতীয় কূটনীতিক পবন কুমার রাইকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তার প্রতিবাদে ভারতও আজ গত ১৯ সেপ্টেম্বর কানাডার কূটনীতিক ওলিভিয়ের সিভেস্টারকে পাঁচ দিনের মধ্যে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রেও ভারতের এই অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করেন কূটনৈতিক মহল। এখন ভারত-কানাডা বাণিজ্যচুক্তির জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটাই দেখার। □

ভারত : যে নামটি যাবতীয় পরিচয় বহন করে এসেছে

কল্যাণ গৌতম

ভারতীয় সংবিধানের গোড়াতেই উল্লেখ রয়েছে, 'India, that is Bharat', shall be a union of states (Part I : 1 (1) Name and territory of the Union)। অতএব 'ভারত', এই একমাত্র নামে যদি দেশকে অভিহিত করার চেষ্টা হয়, তবুও তা সংবিধান- বিরোধী হবে না। আর 'ভারত' নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য আর ইতিহাস। 'ভারত' নামকরণের মধ্যে দাসত্বের কোনো লক্ষণই নেই, পরাজয়ের নঞর্থকতাও নেই। যে দেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম, যে দেশ নিজের দেশকে সুরক্ষিত রাখতে জানে; যে দেশ সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, সে দেশের নাগরিক কেনই-বা লুণ্ঠনকারীদের নামকরণ আজও অবনত মস্তকে মেনে নেবে? যদি বিশ্বের বহুদেশ আপন গরিমায়, আপন অস্মিতায়, শিকড় সংস্কৃতির আবহে অতল গভীরতা থেকে বেরিয়ে নিজের দেশকে নতুনভাবে ডাকতে পারে, তাহলে এদেশই-বা কেন ছদ্মবেশী বিদেশি শক্তির কথায় দাসত্বের গ্লানি বয়ে বেড়াবে? ভারত নাম সংবিধানের পাতাতেই রয়েছে। দেশের নাম তো 'ভারত'-ই! যার নাম 'ভারতরত্ন'-র জন্য সুপারিশ করলেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতাশ করে তিনিই দেখছি 'ভারত' নামে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুনীল গাভাসকারও 'ভারত' নামের পক্ষে। 'ভারত' নামের পক্ষে গোটা দেশবাসী, কিছু অপদার্থ রাজনীতিবেত্তা এবং তাদের দোসর ছাড়া।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার পঙক্তি ধার করে বলতে পারি ('হায় চিল' কবিতা), 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে'। নামকরণের মধ্যে কোনো বেদনা থাকলে তা মুছে ফেলা উচিত। ইন্ডিয়া নামের মধ্যে কেবলই পরাধীনতার গ্লানি, কেবলই পরিচয়ের সংকট (Identity crisis), কেবলই আত্মবিস্মৃতি, মহামৃত্যু লুকিয়ে আছে। যে সুবিধাবাদী, দুর্নীতিপরায়ণ, প্রত্যাখ্যাত রাজনৈতিক দলের ঝিঁঝিঁপোকা (সোশ্যাল মিডিয়ায় 'মহাঠগবন্ধন' বলে খ্যাত), ২৪-এর পরাজয়ের ভয়ে কাঁটা, রাজনৈতিক দেউলিয়ারা দুরন্ত দিন গুনছে, তারাই এবার 'INDIA' শব্দটিতে ভর করে নির্বাচনী তরী পেরোতে চাইছে। কিন্তু সুখের কথা, জনগণ সেটা ধরতে পেরে গেছে। সেটা যে বিদেশি ভাবনার, সেটা যে বাইরের তরী নোঙর করার মতো ব্যাপার, তার খবর রাখেনি তারা! 'I.N.D.I.A.' এবং 'INDIA' এই দুটি কথা যে এক নয়, হতেও পারে না, তা প্রথম শ্রেণীর ছাত্রও বলে দিতে পারবে। 'I.N.D.I.A.'-র প্রবক্তারা বরং তাদের ক্লাস-ওয়ানের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, ভাইপো-ভাইঝির কাছে জেনে নিক, আলাদাটা কোথায়! একটি দেশের নাম ব্যবহার করে জনগণ বা ভোটারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতারণা করার অধিকার নেই তাদের। অনৈতিক এই জোটের ভরাডুবি তাই সময়ের অপেক্ষা। যে কংগ্রেস নামে প্রাক্-স্বাধীনতার পর্যায়ে একটি মঞ্চে বহুমাত্রিক মতাদর্শের বহু দেশহিতৈষী মানুষ একত্রিত হয়ে ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন করতে সমবেত হয়েছিলেন, স্বাধীনতার পর সেই 'কংগ্রেস' নামটি ব্যবহার করে ভোট চাইতে যাওয়া ছিল অন্যায় ও অসাধুতা। নীতিগতভাবে অনুচিত ছিল সেই কাজ। সকলের গ্রহণযোগ্য একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক মঞ্চ হয়ে ভারতীয় ভাবাবেগের সংগঠন রূপে রাজনীতি বিযুক্ত আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা উচিত ছিল সেই সংগঠনের। কেন কংগ্রেস/তৃণমূল কংগ্রেস ইত্যাদি কংগ্রেসি শব্দবন্ধ ব্যবহার করে আজও দলের নাম রয়েছে, সেই নিয়েই তো দেশব্যাপী বড়োসড়ো আলোড়ন ও আইনি লড়াই হওয়া উচিত!

রাজা ভরতের নামে দেশের নাম 'ভারতবর্ষ' বা 'ভারত'। 'বর্ষ' কথাটির অর্থ বিস্তৃত স্থান, মহাদেশ অথবা উপমহাদেশ। যে নামটির মধ্যে কোনো বিশেষ জাতি বা ধর্মসম্প্রদায়ের সম্পর্ক নেই, সেই অসাম্প্রদায়িক নামটিকে যদি দেশের একমাত্র নাম বলে গ্রহণ করি, তাহলে আপত্তি কোথায়?

আপত্তি সম্ভবত 'ভরত' নামটিই, যে রাজার নাম হিন্দু পুরাণের পাতায় রয়েছে! আচ্ছা, হিন্দু পুরাণগুলি কি একটি দেশের হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য নয়? তাকে কি কেবল নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডিতে ফেলে দেওয়া যায়? এ তো আফগানিস্তানে তালিবানদের বৌদ্ধমূর্তি ধূলিসাৎ করার মতোই অপরাধ! I.N.D.I.A. জোটের আঞ্চলিক দলগুলির অনেকে ঠারেঠোরে সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধী, মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেছে, প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে তথা রাজ্যের এক মন্ত্রী, ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্টালিন বলেছেন, 'আমাদের প্রথম কাজ হলো বিরোধিতা নয়, সনাতন ধর্মের আদর্শকে মুছে ফেলা। কিছু জিনিস আছে, যার বিরোধিতা যথেষ্ট নয়, তা নিশ্চিহ্ন করা দরকার। যেমন করোনা, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির বিরোধিতা নয়, তাদের নিশ্চিহ্ন করা দরকার, তেমনই সনাতন আদর্শকেও।' ভাবুন, কত বড়ো সাহস, কতবড়ো ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতার কথা! সরাসরি সনাতন হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করেছেন তিনি। 'ভারত' নামের বিরোধিতা যে এদের মতো দলই করবে, এরাই যে অযৌক্তিক বিরোধিতার হকদার হবে, তা বোঝাই যাচ্ছে।

ইন্ডিয়া নামটির মধ্যে রয়েছে ভারতবর্ষকে ভারতের বাইরের মানুষ কোন অর্থে এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে তার প্রকাশ। India বলতে Indus river বা সিন্ধুনদের তীরবর্তী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বোঝায়। রাজা ভরত কি কেবল এইটুকু ভূ-খণ্ডের অধিপতি ছিলেন? তিনি সমগ্র

ফঃ ২

জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজা ছিলেন। তার বংশধরেরাই ভারত নামে পরিচিত। অর্থাৎ 'ভারত' মানে ভরত শাসিত স্থান। ভারতীয় উপমহাদেশ এক অখণ্ড ও বিস্তীর্ণ ভারত, যা কেবল সিন্ধুনদ পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে ক্ষুদ্র দেখানো যায় না। দেব-পূজার জলশুদ্ধিতে ভারতের নদীগুলির উল্লেখযোগ্য সহাবস্থান, এক সামগ্রিকতার চিত্রকল্প :

'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু।।'

বিষ্ণুপুরাণে রয়েছে,

'উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ।।

উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী আসমুদ্র হিমাচলই হচ্ছে ভারত। এদিকে 'India' শব্দটি আদ্যন্ত বিদেশি। সপ্তদশ শতক থেকে নামটির প্রচলন শুরু হয়েছে। অর্থাৎ কালের গণ্ডিতে নামটি ভারতবাসীর জন্য অর্বাচীন। শব্দটির মধ্যে বিদেশি প্রভাবও প্রভূত পরিমাণে রয়েছে। গ্রিক শব্দ থেকে India শব্দটির উৎপত্তি বলে ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন। তার মধ্যে পরত লাগে ল্যাটিন ভাষার, পড়ে পারসিকের প্রভাবও। ফরাসি Ynde বা Inde হয়ে প্রাচীন আধুনিক ইংরেজিতে হয়ে গেল 'Indie'। গ্রিকরা এক সময় ভারতবাসীকে 'ইন্দোই' বলত, যার অর্থ 'ইন্দাস' নদীর অববাহিকার অধিবাসী। অতএব এই বিদেশি নামকরণে দেশের কোনো গৌরব থাকতে পারে না। গৌরব একমাত্র সেখানেই, যেখানে নিজের দেশকে স্বনামে ডাকতে পারবে ভারতবাসী। 'ভারত' নামকরণ তাই দেশের আবেগ, মানুষের অংশগ্রহণ। এখানে বিবেকের প্রশ্ন, নৈতিকতার প্রশ্ন, স্বনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নও আসবে।

যে বিদেশি শাসক আমাদের তাচ্ছিল্য করে 'নেটিভ' বলে ডেকেছে, তাদের দেওয়া নামকরণটিই কি জাতীয় অস্মিতার রূপক-সংকেত হতে পারে? তাহলে ভারত নামের বিরোধী কারা? বদল একদিন তো আসতই। এখন সেই বদল পূর্ণপ্রাণে চাওয়ার সময়—

'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে,
সিক্তচোখে যাস নে দ্বারে।।'

ভারত আজ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির রত্নমালা আনার জন্য, ভারতমাতার উজ্জ্বল আসন প্রতিষ্ঠা করে জি-২০ সম্মেলনে অতিথিদের সগৌরবে ডেকেছে এই নতুন ভারত দেখানোর জন্য। এখনই তো দেখানোর সময়। অতএব India-র বদলে 'Bharat' লেখা নেমপ্লেটে সমস্ত দেশের সংবাদমাধ্যমের ঝলক লক্ষ শিখায় জ্বলেছে, একই সঙ্গে জ্বালিয়েছে ভারতবিরোধীদেরও।

'ভারত' নামকরণ নিয়ে কংগ্রেস-তৃণমূল-বামপন্থীদের এখন 'যেতেও কাটে আসতেও কাটে' অবস্থা, শাখের করাত। সিপিএমের সময় পাড়ার পাড়ায় একটি গণসংগীতের রেকর্ড বাজত। ক্যালকাটা ইউথ কয়্যারের একটি সংগীতের মিউজিক ডাইরেক্টর ছিলেন ওয়াইএস মুন্সি—

'ভারতবর্ষ সূযের এক নাম
আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে,
লীলা চঞ্চল সমুদ্রে অবিরাম
গঙ্গা যমুনা ভাগীরথী যেথা মেশে।'

সাতমন তেল পুড়িয়ে এইসব গান শুনিয়ে এখন এদের হচ্ছেটা কী! বরং রাজ্যের অশুভ জোটবন্ধনের কারিগরদের কাছে প্রস্তাব, আপনারা বরং মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ওই গানটিও ইউটিউবে শুনে নিন,

'নিজেরে হারায়ে খুঁজি
তোমারই নয়ন মাঝে
চাহিতে পারিনি কিছু
চাহি না মরি যে লাজে।।'

নিজেকে খোঁজার প্রয়াস এখন থেকেই শুরু করুন, অনেক হাহাকার লুকিয়ে আছে আপনাদের জীবনচর্যায় ও মানসচর্চায়, অনেক দেশবিরোধিতা আছে, এবার দেশীয় ঐতিহ্যে নিজের দলকে প্রকৃত অর্থে ভারতীয় করে তুলুন। হ্যাঁ করুন তো দেখি, একটি দল 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (চৈতন্যবাদী),' কিংবা 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (বিবেকানন্দবাদী)! পারবেন? আর হ্যাঁ, স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র'টাও মনে রাখবেন। তিনি পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরামুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্বলতা পরিত্যাগ করতে বলেছেন আমাদের। আপনাদেরও যেন তা মনে থাকে।

কেউ কেউ বলছেন এক প্রতিবেশী দেশ নাকি ছেড়ে দেওয়া 'ইন্ডিয়া' নামে নিজের দেশের নামকরণ করবে। তাই নাকি? তাহলে 'Calcutta' ছেড়ে দেওয়া নামটি আর এক প্রতিবেশী দেশ, তার একটি শহরের জন্য ব্যবহার করুক! জিন্না সাহেব তো Calcutta পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিতেই চেয়েছিলেন, শ্যামাপ্রসাদের জন্য পারেননি। এখন পরিত্যক্ত নামগুলিই না হয় ব্যবহার করে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নিক। কী বাঙ্গালি, মেনে নেবেন তো? ক্যালকাটা নাম হচ্ছে কিন্তু পূর্ব দেশের ওই শহরটার! শহরের যাবতীয় হিন্দু নিধনের ইতিহাস 'ঢাকা' দেওয়া যাবে!

পশ্চিমের প্রতিবেশী দেশটি যদি পরিত্যক্ত 'ইন্ডিয়া' নামটি শেষ পর্যন্ত নিয়েই নেয়, তবে প্রকারান্তরে সেই দেশ কিন্তু 'অখণ্ড ভারত' তৈরির ফাঁদে পা দিয়ে ফেলবে! ভাবুন, ভাবুন, ভালো করে ভাবুন, কমরেড! নতুবা এই 'সারেচ্ছয়ানা' কথা রটাবেন না। এমনিতেই সে দেশের সার্বিক অবস্থা শোচনীয়। দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি। সেদেশের মানুষ দাবি তুলবে এবার তারা ফেলে দেওয়া নাম না কুড়িয়ে সরাসরি ভারতেই যুক্ত হতে চান, কারণ তারা ক্ষুধার অন্ন পেতে চান, বাঁচতে চান, সেদেশ তাদের সে ব্যবস্থা করতে পারেনি, কেবল ভারতের বিরুদ্ধে 'কাঠি' করে গেছে। পারবেন তো সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে? পারবেন কমরেড? অতএব সামাল, সামাল ভাই।

আর যিনি 'ভারতমাতা' unparliamentary বলেছেন, ইতিহাস তাঁকে কোনোদিনই ক্ষমা করবে না। স্বামীজী, ভগিনী নিবেদিতা, ডিএল রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীকে অপমান করেছে তাঁর এই উক্তি। তাঁরা 'ভারতমাতা' শব্দটি নানান সময় গৌরবের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাই জনগণের দরবারে সেই অপরিপক্ক রাজনীতিবিদের সাজা পেতেই হবে। □

অস্তমিত ইন্ডিয়ায় ভারতের সূর্যোদয়

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

কিছুদিন যাবৎ দেশজুড়ে একটি বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। এই দেশ 'ভারত' নাকি ইন্ডিয়া। জি-২০ ডিনারে বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের আমন্ত্রণ পত্রে মহামহিম রাষ্ট্রপতি 'The President of Bharat' লেখা এবং নরেন্দ্র মোদীর ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণের নোটে 'The Prime Minister of Bharat' লিখতেই শুরু হয়েছে তোলপাড়। দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার জুড়েছে— 'এদেশ ইন্ডিয়া, কেবলই ইন্ডিয়া। কোনোকালেই ভারত ছিল না, এখনও নয়। এ দেশকে ভারত নামে ডেকে দ্রৌপদী মুর্মু ও নরেন্দ্র মোদী সংবিধানের অমর্যাদা করেছেন।

শুরু করেছিলেন শতাব্দী প্রাচীন দলের নাবালক নির্বোধ কর্ণধার রাহুল গান্ধী। সে যখন তৃতীয় ছাগশিশুটির মতো কেবল ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে অস্থির, তখন বাকি মেষশাবকগুলিও থেমে থাকল না তারা, ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া বলে পাড়া মাথায় করল। এই অর্বাচীন অর্ধশিক্ষিতরা জানে না এদেশের ইতিহাস, পরম্পরা। জানে না যুগে যুগে এদেশের বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, মহাকাব্যে এদেশকে 'ভারত' নামেই অভিহিত করা হয়েছে। জানে না রাজা ঋষভদেবের বীর পুত্র ভরতের নামে এদেশ ভারতবর্ষ হয়েছে। 'ইন্ডিয়া' নাম ভারতের কোনো প্রাচীন গ্রন্থে নেই। মাত্র ২৩০০ বছর আগে গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস তার 'ইন্ডিকা' গ্রন্থে প্রথম এদেশকে 'ইন্ডিয়া' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু এ দেশের মানুষের কাছে তা কখনও গ্রহণীয় হয়নি। ইংরেজই প্রথম এদেশে শাসন ক্ষমতায় বসে এদেশের প্রাচীনত্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ভুলিয়ে দেবার চক্রান্ত করে আমাদের দেশ ভারতকে 'ইন্ডিয়া' নামে ডাকতে শুরু করে। তাদের চক্রান্তেই ভারতবাসী দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়— একটি 'ইন্ডিয়ান', অপরটি 'ভারতীয়'। যারা ইংরেজের বদান্যতায় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাহেবি কায়দা-কানুন শিখল তারা হয়ে গেল প্রগতিশীল 'ইন্ডিয়ান', আর যারা এ দেশকে ভালোবাসল, দেশকে মা বলল, এ দেশের সংস্কৃতিতে অবিচল শ্রদ্ধা রাখল তারা হয়ে গেল রক্ষণশীল, গোঁড়া, সাম্প্রদায়িক, অশিক্ষিত 'ভারতীয়'। বর্তমানে যারা ইন্ডিয়ার সমর্থক তারা সেই ইংরেজ চক্রান্তের বপনজাত ফসল।

ইংরেজ এদেশে শাসন কায়েম করেছিল ১৭৫৭ সালে। তারা এসে এদেশকে 'ইন্ডিয়া' বলে পরিচিত করেছে। কিন্তু তার আগে? এ দেশ তো ১৭৫৮ সালে তৈরি হয়নি। তবে ইংরেজ আসার আগে এদেশের নাম কী ছিল? নাকি সে ছিল নাম-গোত্র হীন এক দেশ? ইন্ডিয়ার সমর্থকরা এই প্রশ্নের উত্তর সযত্নে এড়িয়ে যান। চতুরতার সঙ্গে এড়িয়ে যান সেই প্রমাণও, যেখানে যুগের পর যুগ ধরে এই দেশকে 'ভারত' নামে ডাকা হয়েছে। আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে রচিত

> **বিশ্বের মাঝে ভারতবর্ষের প্রাচীন গরিমা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর এদেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং মহামহিম রাষ্ট্রপতি। তাদেরই হাত ধরে বুঝি সমাপ্ত হতে চলেছে 'ইন্ডিয়া' যুগের। সূচনা হতে যাচ্ছে 'ভারত' যুগের।**

বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক : উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্, বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ'— প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রমাণ আছে সামবেদের মন্ত্রে যেখানে যাগ-যজ্ঞ-পূজা-অনুষ্ঠানের আগে গৃহকর্তাকে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করতে হয় এই বলে যে— 'অদ্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্ধে শ্বেতবরাহকল্পে সপ্তমে, বৈবস্বতে মন্বন্তরে, অষ্টবিংশতিতম কলিযুগে, কলি প্রথম চরণে, এক চতুর্বিংশতি পঞ্চসহস্র বর্ষ গতাব্দে, 'ভারত' খণ্ডে, জম্বুদ্বীপে' ইত্যাদি। অর্থাৎ পুরাণের যুগ থেকে আজও পর্যন্ত যে সংকল্প মন্ত্র আমরা পাঠ করে আসছি সেখানেও আছে 'ভারতে'র কথা। আরও প্রমাণ, আজ থেকে প্রায় ৫১২৫ বছর আগে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই 'গীতা'র শুরুই হয়েছে 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত' দিয়ে। অর্থাৎ এদেশ 'ভারত'ই। ইন্ডিয়া কখনোই নয়।

বিড়ম্বনা হলো বিদেশি চশমাপরা ইন্ডিয়ার প্রচারকারীরা সেকথা শুনছে কই। হয় এরা অঙ্কে ভীষণ রকমের কাঁচা, নয় শয়তানিতে পাকা। বিষ্ণুপুরাণ থেকে মহাভারত— এদেশে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস প্রাচীন না ১৭৫৭ থেকে ২০২৩ মাত্র ২৬৬ বছরের কালখণ্ড প্রাচীন? চেপে ধরে প্রশ্ন করুন দেখবেন তখন আমতা আমতা করবে। বিদেশি মাদারের অপরিপক্ক কুলাঙ্গার ও অকাল-ভূমিষ্ঠ ২৬টি সন্তানের সমাহার গোষ্ঠীর নেতা-নেত্রীরা এদেশকে বুঝবেন কী করে? এ দেশের শিশুরা যখন মা-ঠাকুমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনে দেশকে জেনেছে তখন এই জন্মজাত হতভাগ্যদের সে সুযোগ হয়নি। এরা এ দেশকে জেনেছে এদের দাদাঠাকুরের কাছে, যিনি নিজেকে হিন্দু বলতে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হতো 'He is an Englishman by education, a Muslim by culture and a Hindu only by accident of Birth'— সেই বদরক্তের উত্তরসূরিদের কাছে 'ভারত' নাম যে 'কর্ণে উষ্ণ সীসা' প্রক্ষেপণের

মতো মনে হবে এতে আর সন্দেহ কী?

গ্রিসের কোনো পরিব্রাজক অথবা কোনো বিদেশি ইংরেজ শাসকের দেওয়া নাম আমাকে কেন বইতে হবে? জন্মের সময় নিজের পরিবারের গুরুজনরাই সন্তানের নামকরণ করেন। যে নামেই সে পরিচিত হয়। কিন্তু আমার নাম আমার পরিবারের কেউ দেয়নি, দিয়েছে পাশের বাড়ির কাকু এমন উপমা বিশ্বে জুড়ি মেলা ভার। তার ওপর এ কোনো ব্যক্তির নাম নয়, একটি প্রাচীন দেশের, যার জন্ম জগতের ঊষাকালে। যে সময়ে আরবের উষর মরুভুমিতে মানুষতো দূর দু-গাছা ঘাসও জন্মাতো না, জেরুজালেমে গডের পুত্রের পূর্বপুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে বনেজঙ্গলে পশুতর জীবন নির্বাহ করত, তখন এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বজুড়ে। আমাদের আলোতেই আলোকিত হয়েছিল তামাম জাতিসমূহ। আর অর্বাচীনের দল বলছে আমাদের নামকরণ করেছে ওরা? যাদের এখনও 'দুধে দাঁত' ফোটেনি, যারা শিক্ষায় দীক্ষায় এদেশের নাতি-পুতি হওয়ার হওয়ার যোগ্য নয় তারা? মুর্খামিরও তো একটা সীমা পরিসীমা থাকা উচিত।

১৭৫৭ সালে এদেশে ইংরেজ আসার আগে এদেশে কেউ 'ইন্ডিয়া' শব্দটি শুনেছে এরকম দু-চার-গাছা লোকও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৮৮৫ সালে অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম যেদিন এদেশের স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষের বিদ্রোহের পুঞ্জীভূত রোষকে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামক সেফটি ভালভ বসিয়ে নির্গমণের ব্যবস্থা করল সেদিন থেকে এই বিদেশি ঔরসজাত দলটির হাত ধরে এদেশে 'ইন্ডিয়া' শব্দের ব্যবহার হওয়া শুরু হলো। কিন্তু সাধারণ জনমানস কোনোকালেই এই নামকে গ্রহণ করেনি। সেদিন কী আজ, এদেশের ৯৯.৯৯৯ শতাংশ মানুষ এদেশকে ভারত নামেই জানে।

এই বঙ্গপ্রদেশের কবি, সাহিত্যিক মনীষীরা তাঁদের সৃষ্টিতে কৃষ্টিতে এই দেশকে ভারত নামেই অবিহিত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যখন লিখলেন— 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ' অথবা 'ধাও ধার সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণ জয় গাথা, রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শোন ওই ডাকে ভারতমাতা', কিংবা 'ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র', অথবা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে সংগীতে লিখলেন 'কহিছ জননী এ ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি' তখন কি তিনি এ দেশকে ইন্ডিয়া নামে কল্পনা করেছিলেন না 'ভারত' নামে? অতুল প্রসাদ যখন তাঁর গানে 'উঠগো ভারতলক্ষ্মী' অথবা হও ধরমেতে বীর গানে 'দেখিয়া ভারতে মহা জাতির উত্থান কিংবা 'বল বল বল সবে... ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' লিখেছেন তখন তিনি এদেশকে ইন্ডিয়া বলে বর্ণনা করেছেন? রজনীকান্ত সেন যখন তাঁর সংগীত মূর্চ্ছনায় 'ভারত কাব্য নিকুঞ্জে জাগো সুমঙ্গলময়ী মা' রচনা করছেন তখন তিনি এদেশকে ইন্ডিয়া নামে বিবৃত করেছেন? জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন লিখছেন--- 'চলরে চল সবে ভারত সন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান' তখন তিনি এ দেশকে কী নামে সম্বোধন করেছেন?

গোবিন্দ দাস যখন লিখছেন, 'আমরা হরিহর, পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা, নামেই কি যায় ভারতভাঙা'— তখন তিনি কোন নামে দেশকে ডেকেছেন? নজরুল ইসলাম যখন এই দেশ জননীর ঔদার্যকে বর্ণনা করছেন, 'উদার ভারত সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান' অথবা 'বিশ্ব হবে মহাভারত নিত্য দিনের বৃন্দাবন' এই ছন্দ মহিমায় তখন তিনি এ দেশকে কী বলে সম্বোধিত করেছেন? আর যাকে নিয়ে বাঙ্গালির আত্মশ্লাঘা কখনই শেষ হওয়ার নয় সেই রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন, 'হে মোর তীর্থ পুণ্য তীর্থ জাগোরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'— তখন কি তাঁর এই সুবিশাল দেশবন্দনার কোনখানে বারেকের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে 'ইন্ডিয়া'র নাম? নাকি তাঁর রচিত জাতীয় মন্ত্র জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, 'ভারত ভাগ্য বিধাতা'র কোনো একটি স্তবকে একটিবারের জন্যও এ দেশকে ডাকা হয়েছে ইন্ডিয়া নামে? —এঁরা কী সব বোকা ছিলেন? নাকি এদের শিক্ষাদীক্ষার অভাব ছিল? যত শিক্ষিত হিউমের বংশজরাই? অবশ্য একটি বিষয়ে নিশ্চিত, এই গানগুলি যদি আজকের দিনে আমাদের তথাকথিত পণ্ডিত প্রবর বুদ্ধিজীবীদের হাতে পড়ত তবে তাদের কলমের খোঁচায় কোনটি হয়ে উঠত 'ইন্ডিয়া ভাগ্যবিধাতা', আবার কোনটি হয়ে যেত 'উঠোগো ইন্ডিয়া লক্ষ্মী' কিংবা কোনটি আবার 'ইন্ডিয়া আমার ইন্ডিয়া বর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো'— এভাবেই।

আসলে এরা কেন 'ভারত' বিরোধী এবং 'ইন্ডিয়া' পন্থী— এ গবেষণার বিষয়। একে তো এই মেকলে শিক্ষায় শিক্ষিতদের এদেশের সব কিছুকে হেয় দেখা মজ্জাগত। তার উপর রয়েছে তোষণের রাজনীতি। টুপি-লুঙ্গি ক্রুশ-আলখাল্লার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে কখন যে এরাও 'সনাতন ভারতের' বিরোধী হয়ে উঠেছে— বোধকরি নিজেরাই জানে না। তাই তাদের চোখে ভারতবর্ষ সনাতন আর্যভূমি নয়। এ হলো 'ইন্ডিয়া'--- জগাখিচুড়ি কম্পোজিট কালচারের ভোগ্যপণ্য। এতে নেই দেশভক্তি, শ্রদ্ধা, স্ব-এর বোধ। আছে কেবল ভোগ-লালসা আর লুটে খাওয়ার বাসনা। তাই তাদের চোখে এ দেশ 'ইন্ডিয়া'ই। ভারত কদাপি নয়।

স্বামীজী তাঁর স্বদেশ মন্ত্রে বলেছেন— 'বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।' তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এদেশে এমনই একদল বিদেশি মনস্ক মানুষের দল তৈরি হবে যারা দেখতে আমাদের মতো হলেও চাল-চরিত্র, মননে -কথনে হবে বিজাতীয়। তাদের উদ্দেশ্য করেই তিনি বলেছিলেন, ' হে ভারত, এই পরাণুবাদ, পরাণুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা— এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? তাঁর দূরদষ্টি যে কত গভীর ছিল তা আজ 'ইন্ডিয়া'র প্রতিভুদের দেখে সহজেই অনুমেয়। রক্তগোলাপের মদিরতায় আজ পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা ও দাসসুলভ দুর্বলতা আজও তাদের নাতিপুতিদের ধমনীতে বদ রক্তের জোগান দিয়ে চলেছে। তারাই আজ 'ইন্ডিয়া'র ধ্বজাধারী।

যে দেশের আস্ত একটা ধর্মগ্রন্থের নাম 'মহাভারত', সে দেশের দুই কানকাটা রাজনৈতিক দল, আর নাককাটা নির্লজ্জ বেহায়া সেকুলার কুল, সকলেই আজ মহা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এ দেশের প্রাচীনত্ব এবং দেবত্বকে ভুলিয়ে দিতে। প্রমাণ করতে এদেশ 'ভারত' নয়, ইন্ডিয়া। কিন্তু বিশ্বের মাঝে ভারতবর্ষের প্রাচীন গরিমা ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর এদেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং মহামহিম রাষ্ট্রপতি। তাদেরই হাত ধরে বুঝি সমাপ্ত হতে চলেছে 'ইন্ডিয়া' যুগের। সূচনা হতে যাচ্ছে 'ভারত' যুগের। স্বাগতম, সুস্বাগতম ভারতম্। □

দুটি নয়, একটিই নাম — ভারত

বরুণ মণ্ডল

দুটি নাম নয়, আমাদের দেশের নাম একটাই, সেটা 'ভারত'। বিরোধী শিবিরের ধারণা সংসদের বিশেষ অধিবেশনে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে পারে কেন্দ্র সরকার। জল্পনা বেড়েছে জি-২০-র নৈশ ভোজের আমন্ত্রণপত্রে 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত' লেখার পর থেকেই।

ভারত বা ভাবতবর্ষ নামের শিকড় পাওয়া যায় পুরাণে এবং মহাভারতে। পুরাণে 'দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে তুষার আবাস'-এর মধ্যবর্তী ভূমিকে ভারত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকের মতে, কিংবদন্তী রাজা ভরতের নাম থেকে 'ভারত' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। তাঁর নাম অনুসারে এদেশের নাম 'ভারতবর্ষ'। সংক্ষেপে ভারত। গ্রিক ও ব্রিটিশদের থেকে হয়েছিল ইন্ডিয়া। কেউ কেউ বলেন সিন্ধু থেকে 'হিন্দু'। সেখান থেকে 'ইন্ডিয়া'। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক দেশগুলি 'ইন্ডি' নামে সমধিক পরিচিত ছিল।

একদল লোক বলেছেন খেয়েদেয়ে কাজ নেই, শুধু নাম পরিবর্তন! ভারত থেকে যারা ইন্ডিয়া করেছিল তাদের কি খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না? গান্ধার নামটা যারা কান্দাহার বানালো তাদের কি খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না? রামমন্দির ভেঙে যারা বাবরি মসজিদ নাম রেখেছিল তাদের কি খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না? নামে অনেক কিছু আসে যায়! তবে বাঙ্গালি মেয়ের নাম ইয়ারুন্নেসা, বাঙ্গালি ছেলের নাম আবু তালেব কেন রাখা হচ্ছে? বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে শব্দের কমতি পড়েছে নাকি! সুন্দর সুন্দর বাংলা শব্দে সন্তানের নাম রাখা যায় না?

এদিকে কিছু বুদ্ধিজীবী অনেক দুশ্চিন্তার ছবি আঁকছেন। তাদের নাকি ভারত নাম নিয়ে

বাড়ছে উদ্বেগ। কারণ সত্যিই যদি কেন্দ্র সরকার নাম পরিবর্তনের পথে হাঁটে তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন করে নাম বদল করতে হবে। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়া' কথাটা যুক্ত রয়েছে সেখানে 'ভারত' কথাটা সংযুক্ত করতে হবে। ফলে কাগজপত্র নতুন ভাবে তৈরি করতে হবে। যেমন কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া, রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ইলেকশন কমিশন অব ইন্ডিয়া এই তালিকার কিন্তু শেষ এই মুহূর্তে হচ্ছে না। এছাড়া সাধারণ নাগরিকের জন্য আধার কার্ড, পাসপোর্ট, ভোটার কার্ডেও ইন্ডিয়া কথাটির পরিবর্তে ভারত কথাটি লিখতে হবে। একদল অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ বলছেন যে এমন নাম বদল করতে নাকি খরচ হবে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা।

প্রশ্ন হলো, ভুলের মাশুল তো গুণতেই হবে। ভুল যখন পূর্বপুরুষেরা করেছে, উত্তর পুরুষদের তো সেই দায় নিতেই হবে। ঝুট ঝামেলা বা খরচের ভয়ে ভুল নামকরণ কেন বয়ে বেড়াবো? ভারতের প্রতিবেশী দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা ১৯৭২ সালে 'সিলোন' নামটি বাতিল করে নতুন নাম শ্রীলঙ্কা চালু করেছে। ২০১৮ সালে আফ্রিকান দেশ সোয়াজিল্যান্ড নিজেদের নাম পালটে রাখে 'ইসোয়াতিনি'। ভারতীয় সংবিধানের ১/১ আর্টিকেলে পরিষ্কার লেখা আছে— India that is Bharat... সুতরাং 'ভারত' নামটি বিভিন্ন কাগজপত্রে কেন ছাপা হয়নি সেটাই তো গভীর চক্রান্তের ব্যাপার! ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা পরবর্তীতে দেশের প্রকৃত নাম 'ভারত' প্রচলন হওয়া উচিত ছিল। ইন্ডিয়া 'শব্দটি এক্ষেত্রে উড়ে এসে জুড়ে বসার মতো!

আধার কার্ড বানানো বা প্রচলন করার ক্ষেত্রেও খরচের অজুহাত দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছিল। ভোটার কার্ড প্রচলন করার আগেও উত্থাপনকারী প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টি. এন. শেসনকে যথেষ্ট সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কংগ্রেস সরকার এই দুটি কার্যক্রমকে হাতে নিয়েও শুরু করেনি। অটলবিহারী বাজপেয়ীর পোখরান বিস্ফোরণের পরীক্ষানিরীক্ষার সময়ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছিল। চন্দ্রযান-২-এর ব্যর্থতা নিয়ে যৎপরোনাস্তি সমালোচনা এবং চন্দ্রযান-৩ অভিযান নিয়েও এখনো সমালোচিত হচ্ছে। ভারতের পক্ষে যতগুলো কার্যক্রম বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছে সবক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষ অযৌক্তিক কারণ দেখিয়ে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। প্রথমে তারা বলেছিলেন ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারা কাশ্মীরের ন্যায্য অধিকার। এ নিয়ে মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচার করেছিল। যুক্তিতে এঁটে উঠতে না পেরে তারাই পরবর্তীতে বলেছিল এ দুটি ধারা উঠিয়ে দিলে দেশে আগুন জ্বলবে। জনগণের মনে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ধারা দুটি বাতিল হওয়ার পর দেশে আগুন তো জ্বলেনি বরং কাশ্মীরের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সেই মতো ভুল বোঝানো শুরু হয়েছিল এবং যথেষ্ট দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু করেছিল। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসে ইন্ধন জোগানো হয়েছিল। করোনাকালে এলআইসি উঠে যাচ্ছে বলে দেশজুড়ে মিথ্যে রটনা করা হয়েছিল। 'ব্যাংকে টাকা রাখা নিরাপদ নয়' বলে প্রচার চালিয়েছিল। কিন্তু বিরোধীদের কোনো প্রচার বাস্তবে কাজে আসেনি।

আসলে ভারত এবং ভারতীয় জনগণকে ভুল বুঝিয়ে রাজনীতি করে এসেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। একসময় পাকিস্তানের মদতে ভারতে সন্ত্রাসী আক্রমণ চলতো। বিরোধীরা মানবাধিকার রক্ষার নামে জঙ্গিদেরই সমর্থন করত। সবই ছিল ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক ট্যাকটিস।

আগের মতোই এখন ভারত নাম নিয়ে মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ মিথ্যে ভয় ছড়ানোর চেষ্টা করছে। নতুন করে আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড করাতে হবে, তার জন্য আবার ছবি তোলার লাইন দিতে হবে, নতুন করে বিভিন্ন কার্ডের মধ্যে সংযুক্তিকরণ করতে হবে অর্থাৎ দৈনন্দিন কাজকর্ম ফেলে এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। এরকম বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির অপচেষ্টা চলছে।

আজকের ভারত নতুন ভারত। পাকিস্তানের ভয়ে এ ভারত কুঁকড়ে থাকে না। জঙ্গি মারা গেলে লক্ষ লোকের মিছিল হয় না। পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের দাম বাড়লে মানুষ চিল চীৎকার করে না। নোট বাতিল করলে মানুষ সরকারকে সহযোগিতা করে। তারা জানে, মোদীজী ভারতীয় জনগণের মন্দ করতে পারেন না। মোদীজী যা সিদ্ধান্ত নেন, তা সাময়িক কষ্টকর হলেও দেশের ভালোর জন্যই সিদ্ধান্ত নেন। আজ ভারত ডিজিটাল হয়ে উঠেছে। সুতরাং বিভিন্ন কার্ডের নাম পরিবর্তন কম্পিউটারের এক ক্লিকেই করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যয়সাপেক্ষ বটে, তবে ঔপনিবেশিক নাম বয়ে আসার 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত' করতে সেই ব্যয়টা করার মতো কোষাগার যথেষ্ট বলিষ্ঠ এখন। কারণ ভারত এখন বিদেশি অনুদানের মুখাপেক্ষী থাকে না; বরং বিদেশে লক্ষ কোটি টাকা অনুদান দেয়। এই ভারত চন্দ্র অভিযান করছে, সূর্য অভিযান করছে। সমুদ্র অভিযান শুরু করবে। শুধু নিজের দেশের নাগরিকদের বিনা পয়সায় করোনা ভ্যাকসিন নয়, বিদেশেও রপ্তানি করেছে। আমেরিকার তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার অর্ধেক বিজ্ঞানী ভারতের, কিন্তু ভারতের ইসরোর সব বিজ্ঞানী ভারতেরই। বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা (যথা ঋষি সুনক) ভারতের মর্যাদা পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের জয়ধ্বনি দিচ্ছেন গর্বভরে। নিজেকে হিন্দু বলতে গর্ববোধ করছেন। ভারত এখন যথেষ্ট স্বাবলম্বী হয়েছে। তাই ঔপনিবেশিক 'ইন্ডিয়া' নাম বহন করার মতো মানসিকতা ভারতের আর নেই।

ঔপনিবেশিক নামের বর্জন অবশ্যই দরকার। আমাদের ইতিহাসেই তো রয়েছে নামের এই পরিবর্তনের ধারা। সেই ধারাতেই দেশের একটিই নাম ভারত থাকা দরকার। ভারতের স্বাধীনতা হস্তান্তর কালে নেতৃত্ববর্গ 'ইন্ডিয়া' এবং 'ভারত' নামের মিশ্রণে মধ্যপন্থা অবলম্বনে যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন, সেই ভুল সংশোধনের এটাই উপযুক্ত সময়। □

অনাদি অতীত থেকে এই দেশের নাম ভারত

ড. কুশল সেন

অনাদিকাল থেকেই প্রাচীনতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী ভারতবর্ষ। কিন্তু এই 'ভারত' নাম অযোধ্যার রাজা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের ভাই ভরত বা রাজা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের নাম থেকে হয়নি। রাজা ভরতের পূর্বের ও পরবর্তী সকল রাজাকেই 'ভরত' বলা হতো কারণ রাজা হিসেবে তিনি তাঁর প্রজাদের প্রবন্ধন ও ভরণপোষণ করতেন। এই যুক্তির সপক্ষে মহাভারতের আদিপর্বের ৭৪নং শ্লোকে, ঋষি বেদব্যাস উল্লেখ করেছেন—

'ভর্তাত ভারতী কীর্তিয়ে নেদম ভারতম্ কুলম্'...

(মহাভারত, আদিপর্ব, ৭৪নং শ্লোক।)

ঋক্‌বেদে 'ভারত' শব্দের বিস্তৃত উল্লেখ করে বলা হয়েছে— 'বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদম ভারতং জন্ম'— ঋক্ বেদ, ৩য় মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত, ১২ শ্লোক। পুরাণে কথিত আছে— আমাদের এই পৃথিবী ৭টি বিশাল দ্বীপে বিভক্ত ছিল। এই ৭টি মহাদেশের কথা কোনো দেশের বা সভ্যতার কোনো প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লেখিত নেই আধুনিক যুগ ব্যতীত। এই ৭টি মহাদেশ বা বিশালাকায় দ্বীপগুলি হলো, প্লক্ষ, শাল্মলি, ক্রৌঞ্চ, কুশ, জম্বু, শাক ও পুষ্কর। এই ৭টি দ্বীপের মধ্যবর্তী দ্বীপ জম্বুদ্বীপের শিবালিক পর্বতমালায় প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল, তাই প্রাচীনতম ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা নিধারণের জন্য বলা হতো— 'আর্যাবর্তে জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে ভারতবর্ষে' অর্থাৎ পৃথিবীর সেই বর্ষ বা খণ্ড যেখানে দেশটি জামুন বৃক্ষের সদৃশ্য তাকেই ভারত বলা হয়। ভরণপোষণের ব্যবস্থা ও বিচারধারা যে দেশে প্রচলিত, তাকেই পৌরাণিক শাস্ত্রে 'ভারত' বলা হয়েছে। আবার ঋক্‌বেদে উল্লিখিত রয়েছে, জম্বুদ্বীপে উত্তর ধ্রুব (Pole Star) থেকে দক্ষিণে পর্বতাঞ্চল হিমক্ষেত্রে যে ত্রিবেষ্টম অবস্থিত তাতে যে অযোনিক সৃষ্টি (বিনা যোনিতে সৃষ্ট প্রাণী) হয়েছিল তা প্রধানত তিন প্রকারের ছিল— বনস্পতি, স্বোদেচ্ছ (লার্ভাযুক্ত প্রাণী), অণ্ডজ (ডিম্ব থেকে সৃষ্ট) এবং জরায়ুজ (স্তন্যপায়ী)। তারা মানস সরোবরের তীরে প্রথম প্রকাশমান হয়েছিল। তাই ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে— 'যুক্তা মাতা শ্বেতভুবি দক্ষিণা অতিষ্ঠঃ গর্ভ' (১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত, ৯ মন্ত্র ঋক্‌বেদ'।) এই অযোনিক সৃষ্টির প্রাণীরা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অর্থাৎ সমতল তরাইয়ের থেকে ধীরে ধীরে দক্ষিণের দিকে প্রাণের বিস্তার করে। সেকালে শস্য ও আনাজ নিজে থেকেই উৎপাদন হতো। 'নাতিশীতোষ্ণ' আধুনিক শব্দ হলেও প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ 'ভরতাগ্নি' থেকেই উদ্ভূত।

ঋক্‌বেদে ২১টি সিন্ধুর উল্লেখ রয়েছে। পশ্চিমে— শতদ্রু, ইরাবতী, বিপাশা, বিতস্তা, দশগতি, সিন্ধু ও সরস্বতী।

দক্ষিণে— কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্মদা, তুঙ্গভদ্রা ও তাপ্তি।

উত্তর ও পূর্বে— গঙ্গা, যমুনা, গন্ডকী, গোমতী, সরযূ, সয়ন্দিকা ও মহানদী।

প্রাচীনতম ভারতখণ্ডে দুটি নদ ছিল যা আজও বর্তমান— ব্রহ্মপুত্র ও শোন। ভারত এত উর্বরা ভূমি ছিল যে প্রথম মানব এই ভূমিখণ্ডেই জন্মগ্রহণ করেছিল। অগ্নি থেকে মেঘের সৃষ্টি, তা থেকেই বৃষ্টি, বৃষ্টিতে জমিতে অন্ন উৎপাদন হতো। এহেন বর্ষে ('বর্ষ' শব্দটি বৃষ ধাতু থেকে উদ্ভূত) বা খণ্ডে যারা বসবাস করতেন তরা খুব শক্তিশালী ও পরিশ্রমী লোক ছিলেন। তাই 'শতপথ ব্রাহ্মণ' নামক প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে— 'লোকয়ম্ ভারতবর্ষম্'। এই ভারতবর্ষ বা ভারতখণ্ডের মানুষ 'আত্মবৎসর্বভূতেষু'র সাংস্কৃতিক চেতনা ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ ছিল বলেই ভারতের মানুষকে দিব্যমানব বা মহামানব বলে উল্লেখ করা হয়েছে— 'মনুর্ভব জনেয়া দেব্যম্'।

জম্বুদ্বীপের প্রাচীন অধিপতি মহারাজ অগ্নীধ্রর ৯টি পুত্র ছিল। নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল। রাজা অগ্নীধ্র জম্বুদ্বীপকে ৯টি খণ্ডে ভাগ করে নয় পুত্রকে ৯টি খণ্ডের রাজা চয়ন করেন। রাজা নাভির নামে একটি বর্ষ বা খণ্ডের নামকরণ করা হয়, যার নাম হয়— অজনাভ বর্ষ। রাজা নাভি এবং তাঁর পত্নী মেরুদেবীর এক পুত্র ছিলেন যার নাম ছিল ঋষভদেব। ঋষভদেবের সবচেয়ে বড়ো পুত্রের নাম ছিল ভরত। তাই অজনাভ বর্ষ বা খণ্ডের নাম হয়— ভারতবর্ষ। পুরাণের ভিত্তিতে প্রাচীনতম ভারতবর্ষের বিস্তার ৯০০০ যোজন বা ৮১০০০ মাইল ছিল। ভারতবর্ষ অন্য বর্ষ বা খণ্ড থেকে শ্রেষ্ঠতর। কারণ ভারত কর্মভূমি আর অন্যান্য বর্ষ বা খণ্ডগুলি ভোগভূমি।

এখন প্রশ্ন হলো 'ভারত' শব্দের এমনকী গূঢ় অর্থ বা তাৎপর্য রয়েছে, যা বিশ্বের দুটি মহত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থে (রামায়ণ ও মহাভারত) প্রাচীনকাল থেকেই স্থান পেয়েছে। 'ভারত' প্রকৃতপক্ষে তিনটি শব্দ দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে।

ভা— ভাবনা বা প্রকাশ, ঈশ্বরীয় সত্য (সাময়িকরূপে সাদা জ্যোতিঃ-র প্রকাশ)

র— রজস বা রজঃগুণ (লোহিত বা লাল রং)।

ত— তমস বা তমঃগুণ (শ্যাম বা কৃষ্ণ)। 'রত' শব্দার্থে লীন হওয়া অর্থাৎ এমন দিব্যভূমি যেখানে বসবাসকারী লোক সত্যের সন্ধানে ধ্যানে রত বা লীন থাকে। আবার ঈশপোনিষদে বলা হয়েছে প্রকৃতি ও দৃশ্যমান জগৎ শুক্ল (সাদা), লোহিত (লাল), কৃষ্ণ (কালো), এই ত্রিবর্ণের এক বিচিত্র সমাহার। 'অজয়ে একম লোহিত শুক্ল কৃষ্ণম প্রকৃতিঃ'— ঈশপোনিষদ।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতেও এই তিন বর্ণের সমাহার লক্ষণীয়। উত্তরভারতে হিম বা বরফাচ্ছাদিত হিমালয় সাদা বর্ণের বা শুক্লবর্ণ; এখানকার লোক আনুপাতিকরূপে ফর্সা বা শ্বেতবর্ণের। তরাই অঞ্চল বা বিন্ধ্যাচলের মৃত্তিকার রং গম বা হালকা পীত বর্ণের। দ্রাবিড় অঞ্চলের মৃত্তিকার রং কৃষ্ণ। লোক আনুপাতিকরূপে কালো। তাই এই দেশের নাম হলো ভারতবর্ষ বা ভারত যা প্রকৃতপক্ষে সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ— এই তিনগুণের সমষ্টি।

(লেখক সদস্য, ভারতীয় মার্গদর্শক মণ্ডল, ভারতীয় বৈদিক জ্যোতিষ সংস্থানম, বারাণসী)

ইন্ডিয়া না ভারত বিতর্কের প্রয়োজন নেই

তথাগত রায়

ইদানীং একটি তর্ক মাথা তুলেছে যেটি আমার চোখে অর্থহীন বলে মনে হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির একটি আমন্ত্রণপত্রে তাঁকে ইংরেজিতে President of India না লিখে President of Bharat লেখা হয়েছে। এই নিয়ে দেশের বিরোধী দলগুলি যথারীতি হইচই করছেন, কেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে এরকম একটা পদক্ষেপ নেওয়া হলো, এর পিছনে কোনো গোপন (এবং তাঁদের মতে অবশ্যই সাম্প্রদায়িক) উদ্দেশ্য নিহিত আছে? সাদা চোখে ব্যাপারটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

আমাদের সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্যটিই হচ্ছে, 'India, that is Bharat, shall be a union of states'। এখানে লক্ষণীয়, Union of States বলা হয়েছে, ফেডারেশন নয়, অর্থাৎ যাঁরা (অবশ্যই আঞ্চলিক দলের নেতারা) federal structure অথবা 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো' বলে প্রায়ই চীৎকার-চ্যাঁচামেচি করেন সেটা এতো সরল নয়। ঘটনা হচ্ছে, ভারত একটি দেশ, তাকে বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত করা হয়েছে। এই রাজ্যগুলি নিজের থেকে একত্রিত হয়ে ভারত গঠন করেনি, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করেছে। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

সংবিধানের শুরুতে যে 'India that is Bharat' বাক্যবন্ধ রয়েছে তার মানে বা তাৎপর্য কী? এটিকে বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'ইন্ডিয়া ওরফে ভারত'। অর্থাৎ যাহাই ইন্ডিয়া, তাহাই ভারত। একটি অন্যটির প্রতিশব্দ মাত্র। একটি মানুষের ভলোনাম যদি পঞ্চানন হয়, আর ডাকনাম যদি পাঁচু হয়, তাহলে কি পঞ্চানন আর পাঁচু আলাদা লোক হয়ে যায়? পঞ্চাননকে পাঁচু বলে ডাকলে সে রাগ করতে পারে, কিন্তু তার আইডেন্টিটি বা পরিচয় নিয়ে কোনো সংশয় জন্ম নিতে পারে না। বাংলায় এরকম একটি প্রবাদও আছে, 'ভিনগাঁয়ের মধুসূদন স্বগ্রামের মেধো'।

এক দেশের একাধিক নাম— এই ব্যাপারটা কী শুধু ভারত আর ইন্ডিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ? আদৌ তা নয়। যে দেশকে আমরা জার্মানি বলি নিজের দেশের মানুষের কাছে তারা নাম Deutschland। অনুরূপভাবে যাকে আমরা জাপান বলি তাকে দেশের লোক নিপ্পন বলে। আমাদের ঘরের পাশের দেশ ভুটানের নাম তাদের ভাষায় 'দ্রুক'। যাঁরা ডাকটিকিট জমান (এই লেখকও ছোটোবেলায় জমাত) তাঁরা জানেন, ডাকটিকিটে কত দেশের কতরকম নাম ছাপা থাকে, যেমন, 'Switzerland'-এর জায়গায় 'Helvetia', 'Finland'-এর জায়গায় 'Suomi'। তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? বহু দেশ নিজেদের নামও পালটায় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সংবিধান সংশোধনও করে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা, যাকে আমরা বাংলায় সিংহল বলি, ব্রিটিশ শাসনে তার নাম ছিল সিলোন, মায়ানমারের নাম ছিল বার্মা।

একটি ধারণা অনেকে পোষণ করেন, যার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণভাবে ভিন্নমত। এই ধারণাটি হলো ইন্ডিয়া হচ্ছে সেই সব লোকেদের দেশ যাঁরা শহরে থাকেন, যাঁরা উচ্চবিত্ত, ইংরেজিতে কথা বলেন এবং চিন্তা করেন, ইত্যাদি। অপরপক্ষে ভারতের অধিবাসী সেই সব মানুষ, যাঁরা মাটির কাছাকাছি, গ্রামাঞ্চলে থাকেন, ভারতীয় ভাষায় চিন্তা করেন বা কথা বলেন ইত্যাদি। এরকম ধারণার বশবর্তী হবার কোনো কারণ নেই, এর সপক্ষে কোনো যুক্তিও নেই, কোনো আদালতও এরকম ঘোষণা করেননি। কিন্তু যেহেতু দেশের দুটি নাম রয়েছে সেইজন্য তার অধিবাসীদের দু'রকম হতেই হবে, সেইজন্য এঁরা এই ভ্রান্ত ধারণাটিকে সযত্নে লালনপালন করেছেন। তাহলে যখন কোনো গ্রামের মানুষ শহরে এসে বসতিস্থাপন করেন, অথবা কোনো নিম্নবিত্ত মানুষ নিজের চেষ্টায় ধনী হন তাঁরা কি নাগরিকত্ব পরিবর্তন করে ফেলেন?

কোনোটাই নয়, অতএব এই ধারণাটিই ভুল। Germany আর Deutschland-এর মানুষ, Japan আর Nippon-এর মানুষ যেমনি আলাদা নয়, তেমনি ভারত আর ইন্ডিয়ার মানুষও আলাদা নয়। আমাদের সংবিধান প্রণেতারা যথেষ্ট চিন্তা করেই 'India, that is Bharat' বাক্যবন্ধটিকে সংযোজন করেছিলেন। এর জন্য অতিরিক্ত তর্কের প্রয়োজন নেই, সংবিধান সংশোধনেরও প্রয়োজন নেই। একই দেশের দুটি নাম, সরকার সমেত যে কেউ যে কোনো একটি নাম ব্যবহার করতে পারেন। ▫

ভারতের জনগণনা

ইংরেজ আমল থেকেই আমাদের দেশে প্রতি দশ বছরে একবার করে জনগণনা হয়ে আসছে। ১৯৪১ সালে জনগণনার আগে গান্ধীজী কংগ্রেস নেতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বঙ্গের হিন্দুরা যেন জনগণনায় অংশগ্রহণ না করে। অন্যদিকে মুসলিম লিগ নেতা জিন্নার নির্দেশ ছিল বঙ্গপ্রদেশের প্রতিটি মুসলমান যেন জনগণনায় অংশগ্রহণ করে। ফলে অখণ্ড বঙ্গ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে গেল। পরবর্তীকালে যখন পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব উঠল তখন সমগ্র বঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা উঠেছিল। যাইহোক সে অন্য প্রসঙ্গ। প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীন ভারতে প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হয়ে থাকলেও কোনও রহস্যময় কারণে ২০২১ সালে, জনগণনার কথা থাকলেও সেটা করা হয়নি। হতে পারে সেটা করোনার কারণে। কিন্তু ২০২২ সালে এমনকী ২০২৩ সালেও জনগণনার কথা একবারও শোনা যাচ্ছে না। রহস্যটা কী? অনেকে বলে থাকেন বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের অসম্ভব রকমের জনসংখ্যা বৃদ্ধি যাতে জনসাধারণের গোচরে না আসে তাই সতর্কতা। সত্যিই কি তাই? প্রশ্নটা উদ্বেগজনক নয়?

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

এক দেশ এক ভোট

কেন্দ্রীয় সরকার সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ থেকে ২২ তারিখে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকেছে। বিজেপি বিরোধী শিবিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তাদের ধারণা নরেন্দ্র মোদী এক দেশ এক ভোটের জন্য বিল আনতে চান। সিপিএমের রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য এই বিলের বিরোধিতা করে জানান তারা এটা মানবে না। তারা প্রতিবাদ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে I.N.D.I.A.-র আর এক শরিক তৃণমূল, তারাও বিরোধিতা করবে। তাদের মতে এই কাজ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। বিজেপি এই বিলের সমর্থক।

কেন্দ্রীয় সরকারের আনা বিল তা বিজেপি সমর্থন করবে এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বিজেপির বক্তব্য পরিষ্কার। (১) একসঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন হলে তাতে অর্থের সাশ্রয় হবে। এক সঙ্গে নির্বাচন হলে সরকারের যে অর্থ বাঁচবে তা দেশের উন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। উন্নয়নের গতি ও পরিধি দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। (২) সরকারের আধিকারিকদের নির্বাচনী কাজ করাতে সরকারের বহু টাকা খরচ করতে হয়। (৩) বারবার ভোটে সাধারণ মানুষের নানাবিধ সমস্যা দেখা যায়। একসঙ্গে ভোটে সুবিধা অনেক। বার বার স্কুল বন্ধ রাখা হবে না। সেখানে থাকে ভোটে নিযুক্ত নিরাপত্তা কর্মীরা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকবার লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে। তাতে কোনো অসুবিধা তো হয়নি। তাহলে দেশের কথা না ভেবে শুধু শুধু বিরোধিতা করা কেন? প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে, এক দেশ এক ভোটের কথা বেরিয়েছে মানেই এটাকে কৌশল ভাবতে হবে কেন? যদি এই প্রক্রিয়াতে অর্থ বাঁচে তা দেশের মানুষের উন্নয়নে লাগবে। (৪) এছাড়া বিশ্বের বহু দেশেই এই ভাবে এক সঙ্গে ভোট করে।

ভারতবর্ষের বিরোধী দলগুলি রাজ্যে রাজ্যে নিজেরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সর্বদা অভ্যস্ত। তারাই আবার নিজেদের স্বার্থে সবাই সবাইয়ের হাতে হাত রেখে নরেন্দ্র মোদীকে গদিচ্যুত করার পরিকল্পনা করছে। এই নিবন্ধটি লেখার সময়ও তারা (I.N.D.I.A.) তৃতীয়বার একজোট হওয়ার জন্য বোম্বাইয়ের অত্যন্ত দামি হোটেলে মিলিত হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে ওখানে এক লিটার পানীয় জলের বোতলের দাম ১৪৫ টাকা। এরপর রয়েছে তার কর। জলের বোতলের দামের কথা বলার প্রয়োজন হলো এই জন্যই যে, 'এক দেশ, এক ভোট' চাওয়া হচ্ছে মূলত দেশের অর্থের সাশ্রয় হবে বলে। যারা সভার নামে ভারতের মতো দেশে দেদার টাকা ওড়াতে পারে তারা যে দেশের টাকার পরোয়া করে না এটা পরিষ্কার।

বিরোধী জোট এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন করবে না এটাই স্বাভাবিক। তারা বলছেন যুক্তরাষ্ট্রের কথা। কিন্তু এটা শুধু কথার কথা। আসলে ওই জোটের আছে নিজেদের সমস্যা। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এরা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লোকসভা নির্বাচনে একজোট হয়েছে। এর মধ্যে যদি লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন এক সঙ্গে হয় তাহলে তাদের সামনে বিরাট সমস্যা। রাজ্যে রাজ্যে তারা নিজেরা একে অপরের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। কী হবে সেখানে? এখনও তারা নিজেরা একজন প্রধানমন্ত্রীর মুখ খাড়া করতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রীর মুখ ঘোষণা করলেই ভেঙে যাবে ওদের জোট। এমন অবস্থায় রাজ্যে রাজ্যে কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ খাড়া করবে ওরা? যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর মুখ হন তবে কে হবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ। কংগ্রেস ও সিপিআইএম কী করবে তখন? সব রাজ্যেই ওদের এক সমস্যা। যে সংগঠন দেশের কথা ভাবে না তারা কেমন ভাবে দেশ চালাবে তা ভালো ভাবেই অনুমান করা যায়। যারা নিজেদের বাঁচাতে জোট করে দেশের প্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে, এবার আমাদের নিজেদের পরিবার, ছেলে-মেয়ের স্বার্থে ওদের চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

চন্দ্রযান তিনের জন্য খরচ—দুই বছরের পুজো কমিটির জন্য সরকারের খরচ

গত ২৩ আগস্ট দিনটি ভারতীয় ইতিহাসের এক সোনার দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সারা দেশের ১৪০ কোটি উদ্বেলিত মানুষের সঙ্গে আনন্দে অংশ নিতে পেরে আমিও গর্বিত। স্বাধীনতার আনন্দের সঙ্গে তুলনীয় এই আনন্দ। একই মাসে

ফ ঃ ৩

স্বাধীনতা দিবস ও চন্দ্র বিজয় যেন সময়ের সমাপতন। এই চন্দ্র বিজয়ের গৌরব নিশ্চিতভাবে সেই সব বিজ্ঞানীর প্রাপ্য যাঁরা দিনরাত এক করে এই সাফল্য এনেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, এত কম খরচে এতো বড়ো সাফল্য দেশকে দিয়েছেন এই মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। খরচ মাত্র ৬৫০ কোটির আশপাশে। যা দিয়ে নাকি একটা বলিউডের সিনেমাও তৈরি করা যায় না।

চন্দ্র বিজয়ের ঠিক একদিন আগে ঘুষ দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত ও কেনার কৌশল নিল শাসকদল। এবার আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেদার অনুদানের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে প্রতিদান হিসেবে পাশে থাকতেও বললেন। প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ভোটের সময়ে এই অনুদান প্রাপকরা যেন ভোট লুটে সহায়তা করে। এবার দেখা যাক করদাতাদের পয়সা কীভাবে অপচয় করে শাসকদল স্রেফ দলীয় স্বার্থে। ৪৩ হাজারেরও বেশি ক্লাবগুলো অনুদান পাবে ৭০ হাজার টাকা করে যা গতবারের চেয়েও ১০ হাজার টাকা বেশি। এই বাবদ সরকারের কোষাগার থেকে বেরিয়ে যাবে ৩০০ কোটি টাকারও বেশি। অর্থাৎ দু' বছরের দানখয়রাতি বাবদ ব্যয় হবে সরকারের প্রায় ৬০০ থেকে সাড়ে ৬০০ কোটি টাকা যা চন্দ্রযান খরচের সমান। অথচ সম পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ২৫ হাজার টাকা মাথাপিছু মাসে খরচ করলে সরকার দশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারে।

রাজ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ সরকারি পদ বাতিল করা হয়েছে অর্থের অভাবে। জেলায় জেলায় বিদ্যালয়গুলো ধুঁকছে শিক্ষকের অভাবে। বিদ্যালয়গুলোতে পড়ুয়াদের সংখ্যা কমছে, পড়ুয়াদের অভাবে অনেক বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দিতে অপারগ, কারণ অর্থ সংকট। অপরাধীদের বাঁচাতে সরকারি কোষাগার থেকে করদাতাদের পয়সায় নামি আইনজীবীদের নিয়োগ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ থেকে সর্বোচ্চ আদালতে মামলা লড়ে হারছে সরকার। রাজ্য সাড়ে ছয় লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থের ঋণ ইতিমধ্যেই চাপিয়ে দিয়েছে রাজ্যবাসীর কাঁধে। চন্দ্রযান যেদিন সাফল্যের সঙ্গে চাঁদের মাটি ছুঁলো, সেদিন সারাদেশ যখন আনন্দে ভাসছিল সেদিনই রাজ্যের মালদা জেলার তেইশ জন মানুষ মারা গেল মিজোরামের এক রেলসেতু দুর্ঘটনায়। এরা সবাই পরিযায়ী শ্রমিক। এতদিন আমরা জেনেছি পরিযায়ী শ্রমিক কেবল দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে যায়, এখন তো দেখা যাচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক উত্তর-পূর্ব রাজ্যেও যাচ্ছে কাজের সন্ধানে। নিহত মানুষগুলোর পরিজনরা ক্যামেরার সামনে সরাসরি সরকারকেই দায়ী করছে, এই রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থান করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কি কখনও হুঁশ হবে? দানখয়রাতি বন্ধ করে টাকাগুলোর অপচয় বন্ধ করে সাড়ে পাঁচ লক্ষ বিলুপ্ত পদগুলো আবার সৃষ্টি করে সেখানে লোক নিয়োগ করলে লাভবান হবে সেইসব পরিবারগুলো, যাদের পরিজন কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনার বলি হচ্ছে। কোনও আর্থিক ক্ষতিপূরণ কি কখনো প্রিয়জনের হারানোর ব্যথা পূরণ করতে পারে? আমাদের নেতা-নেত্রীদের ঘুম কখনো ভাঙবে না, কারণ পরিযায়ী শ্রমিকদের এই মৃত্যু মিছিলে কখনো এদের পরিবারের কেউই শামিল হয় না। এরা কেবল কুমিরের অশ্রুপাত করে কিছু অনুদানের কথা ঘোষণা করে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলি।

মেকলের ভারত নয়, চাঁদে পা রাখল তিরুপতির ভারত, মোদীর ভারত

ইসরোর বিজ্ঞানীরা কেন তিরুপতি যাবে? হিন্দু মন্দিরে পুজো দেওয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইসরোর বিজ্ঞানীদের জন্যই চাঁদে কখনও পা রাখতে পারবে না ভারত, বলা 'কমরেডস ইন দ্য ফ্যাকাল্টি'দের জবাব দেওয়ার জন্যই বিক্রমের চাঁদে নামটা জরুরি ছিল। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান কেড়ে নিয়ে আমাদের ধরানো হয়েছিল নতুন বই। আমাদের শেখানো হয়েছিল ভারতে কিছু নেই, ভারতের কিছু নেই, ভারতের কখনও কিছু থাকবে না এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে ভারতের কখনও কিছু ছিল না। সেই মেকলের আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কিছু লোক আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে যা কিছু ভালো তা হয় রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন, কমিউনিজমে। ভারত পারে না, এই বোঝানোগুলোকে জবাব দেওয়ার জন্য আজ চাঁদে বিক্রমের নামটা জরুরি ছিল।

আমরা ভারতীয়রা নেটিভ। আমরা পারি না। সভ্যতার সূচনাকালে আমরা নদীতে বাঁধ দিয়েছিলাম। আমরাই বিশ্বকে শিখিয়েছিলাম বাড়ির পাশে রাস্তা ও জলনিকাশি ব্যবস্থা। বিশ্বকে 'বাথরুম'-এর কনসেপ্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছি আমরাই। যখন দেশে দেশে লড়াই চলত পৃথিবী ঘোরে না সূর্য! আমরাই নবগ্রহের বিশ্বাস দিয়েছি বিশ্বকে। ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঔলুক্য নামের একজন গুণী এই ভারতে জন্মেছিলেন, তাঁর মনে প্রশ্ন জন্মায় প্রত্যেক বস্তু কেন ভিন্ন ধরনের? কী এমন রয়েছে তাদের মধ্যে যার কারণে তাদের ধর্ম আলাদা? কী দিয়েই বা তারা তৈরি? এই প্রশ্নের খোঁজ শুরু করেছিলেন ভারতীয় ভদ্রলোক এবং ডালটনের থেকে প্রায় ২৬০০ বছর আগেই তিনি অ্যাটমিক থিয়োরি লিখে গিয়েছেন। কণা (বস্তুর ছোটো ক্ষুদ্র কণা)-র গবেষণায় তিনি এতটাই ডুবে ছিলেন যে তাঁর নামই হয়ে যায় ঔলুক্য থেকে কণাদ।

কণা থেকে সার্জারি, কী দিইনি আমরা বিশ্বকে? কিন্তু তারপরও আগে ইংরেজ, মুঘল, এখন কিছু 'কমরেড ইন দ্য ফ্যাকাল্টি' আমাদের বুঝিয়ে যাবে ভারতের কিছু ছিল না, ভারত কিছু পারে না, ভারত কিছু পারবে না! শুধু বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায় সংযোজনের জন্য নয়, এই ভারতবিরোধীদের মুখে ঝামা ঘষে দিতে বিক্রমের বীরবিক্রমে চাঁদে নামাটা জরুরি ছিল। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মের মিশ্রণে যে মিরাকেল ঘটে আবারও প্রমাণ করল ভারত। নতুনকে, বিজ্ঞানকে স্বাগত জানাতে গেলে নিজেদের শিকড় ভুলতে হয় না তা আবারও প্রমাণ করল ভারত।

—শেখর ভারতীয়, কলকাতা।

জনজাতি সমাজে নারী

শুভশ্রী দাস

জনজাতি সমাজে মহিলারা পুরুষের সঙ্গী। পুরুষদের তাঁরা সহকর্মী। সমাজ ও পরিবারে তাঁদের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকে। জনজাতি মহিলারা গ্রাম বা শহরের অন্য সমাজের মহিলাদের মতো পুরুষদের মুখাপেক্ষী থাকেন না। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের জন্য তাঁরা তাঁদের পুত্র বা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁরা অন্য সমাজের মহিলাদের থেকে শারীরিকভাবে সক্ষম। তাঁরা শুধু ঘরকন্নার কাজ করেন না, ছেলে-মেয়ে প্রতিপালন করেও তাঁদের সারাদিন জমিতে কাজ করতে দেখা যায়। জমিতে ফসল বুনতে, বড়ো করতে ও ঘরে তুলতে সারা বছরই তাঁদের বড়ো ভূমিকা থাকে। মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার জনজাতি মহিলাদের অধিকার অসীম। ঘরে-বাইরে সমস্ত কাজ তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁদের স্বামী প্রতি পদে তাঁদের অনুগামী থাকেন। খুবই পরিশ্রমী ও স্বাভিমানী এই সমাজের মহিলারা। খেতখামারের কাজকর্ম থেকে হাটবাজার সব তাঁরাই করেন। কোন জনিতে কী চাষ হবে তা ঠিক করে তাঁরাই। পরিবারের জমিজমার পুরো অধিকার মেয়েদের ওপর থাকে। ধানের চারা ওঠানো, কড়া রোদ অথবা মুসলধারে বৃষ্টির মধ্যে রোপণ করা, দেখাশোনা করা এবং ঘরে তোলা সবই মহিলাদের দায়িত্ব। বাজারে বিক্রির দায়িত্বও তাঁদের। জনজাতি সমাজে এমন কোনো মহিলা পাওয়া যাবে না যিনি শুধু ঘরের কাজ করেন। এই সমাজের স্কুল-কলেজে পড়া মেয়েরাও পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেতখামারের কাজও সমানভাবে করে থাকেন।

জনজাতি সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টা গ্রাম-শহরের শিক্ষিত মেয়েদের কল্পনার অতীত। ফসল লাগানোর পর তদারকির জন্য যখন মহিলারা জমিতে ব্যস্ত থাকেন তখন পুরুষরা বাড়িতে শিশুদের পরিচর্যায় মনোনিবেশ করেন। ঘর মেরামতির কাজ করেন। বাড়ির উঠানে বা লাগোয়া জমিতে সবজি, ফল বা লতাপাতার গাছ দেখাশুনা করেন। ঘরে বৃদ্ধ বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুরমার প্রতি খেয়াল রাখেন। প্রতি পদক্ষেপে পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্ত্রী-অস্মিতার অপূর্ব মিশ্রণ জনজাতি সমাজে দেখা যায়। এই সমাজের মহিলারা পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারিণী। তাঁদের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন যে, তাঁরা নিজের জীবনসঙ্গী নিজেই বেছে নিতে পারেন। শুধু তাই নয়, বিয়ের আগেই হবু স্বামীকে বাজিয়ে দেখে নেওয়ার অধিকারও তাঁদের পূর্ণমাত্রায় থাকে। এই পরম্পরাকে তাঁদের ভাষায় লমসেনা বলা হয়। এই প্রথায় বিবাহযোগ্য যুবককে যুবতীর বাড়িতে থেকে সমস্ত কাজকর্মে নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত হতে হয়। এই পরীক্ষায় পাশ অথবা ফেল করানোর পুরো অধিকার যুবতীর ওপরই থাকে। এই প্রথা এখনও মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড সমাজে পূর্ণ মাত্রায় আছে।

জনজাতি সমাজের মেয়েরা একা থাকতেও ভয় পান না। ঈশ্বর তাঁদের শারীরিক শক্তি পুরুষদের থেকে কম দেননি। এই সমাজের মহিলারাও তির-ধনুক, বল্লম, গুলতি ব্যবহারে বেশ দক্ষ। ধনী জনজাতি পরিবারে তাই ডাকাতি হওয়ার কথা খুব কম শোনা যায়। শিশুকাল থেকেই মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে তির-ধনুক, বর্শা ও গুলতি ব্যবহারের শিক্ষা স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে থাকেন। সারাদিন মাঠে-ঘাটে-খাদানে হাড়ভাঙা খাটুনি করেও সন্ধ্যায় চাঁদের আলোয় পুরুষদের সঙ্গে মাদলের তালে তালে তাঁরা পরম্পরাগত নৃত্যগীতে মেতে ওঠেন, তখন মনেই হয় না সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাঁদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হওয়ায় পুরুষরা তাঁদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন না। কোনো জনজাতি দম্পতি ক'টি সন্তানের জনক-জননী হবেন তাও নির্ভর করে স্ত্রীর সম্মতির ওপর। আজ জনজাতি সমাজের অনেক মেয়ে লেখাপড়া শিখে হিল্লী-দিল্লি এমনকী ইংলন্ড, আমেরিকাতেও বসবাস করছেন।

আজ নারীশক্তি জাগরণ, নারী সচেনতা বৃদ্ধির জন্য নানা রকমের সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ চলছে। কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে নারী স্বাধীনতার অগ্রদূত এই এই সমাজের মহিলাদের কথা বড়ো কেউ উল্লেখ করেন না। যদি শহরের মতো সুযোগসুবিধা তাঁরা পেতেন, তাহলে তাঁদের মনোবল, উৎসাহ ও শক্তি বাকি নারী সমাজের কাছে অনুকরণীয় হতো— একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়।। বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতি এই সমাজ থেকেই উঠে এসেছেন। জনজাতি সমাজের মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে বাকি সমাজের মেয়েদের কাছেও প্রেরণাস্বরূপ। □

ঘুমে বিলম্বের কারণে ক্ষয় হচ্ছে জীবনশক্তি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

ইংল্যান্ডের একদল গবেষক চার লক্ষ মানুষের ওপর গবেষণা করে দেখেছেন, যারা রাতে দেরি করে ঘুমাতে যান, সকালে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠেন, তারা কোনো না কোনো ভাবে নানান মানসিক রোগে আক্রান্ত। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, পড়াশোনার কারণে হোক বা কাজের কারণে কিংবা নিছক আড্ডার কারণেই হোক যারা বেশি রাতে ঘুমাতে যান এবং সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন, তাদের মধ্যে যে সমস্যাগুলি দেখা যায়। সেগুলো হলো :

অকালমৃত্যুর ঝুঁকি : গড় আয়ু কমে যাওয়া। ৬.৫ বছর কম গড় আয়ু। বিভিন্ন মানসিক রোগ ৯০ ভাগ মানুষের মধ্যে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ৩০ ভাগ মানুষের। হজম শক্তি ব্যাঘাত। স্নায়ুতন্ত্রে জটিলতা, অন্ত্রের জটিলতা।

ব্রিটেনে এই গবেষণা রিপোর্টের ফলে সে দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এখন চাকরি নেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে, রাতে ক'টায় ঘুমাতে যান এবং সকালে ক'টায় ঘুম থেকে ওঠেন? এই অবস্থা আমাদের সমাজেও এখন ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এখন গ্রামগঞ্জে মধ্যরাতে চা পাওয়া যায়, অর্থাৎ চা খাওয়ার লোক থাকে মধ্যরাত পর্যন্ত। আর শহরে মানুষের জীবনব্যবস্থা আরও বেশি রাত জাগানির্ভর। চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ মানুষ অফিস বা কর্মক্ষেত্র থেকে ফেরেন ৯টা থেকে ১০টায়, নিম্ন আয়ের মানুষ আরও দেরি করে ফেরেন ঘরে। রাতে খাবারের রেস্টুরেন্ট বেশি ব্যস্ত থাকে। বিরিয়ানি খাওয়া নতুন প্রজন্ম রাত গভীর হলেই খেতে যায়। শহরে এখন অনেক রেস্টুরেন্ট পাড়ার মতো কিছু এলাকা গড়ে উঠেছে। সেখানে রাত ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত খাবার পাওয়া যায় এবং রীতিমতো ভিড় থাকে। নতুন প্রজন্ম আরেকটি রোগে আক্রান্ত, তা হচ্ছে মোবাইল, ট্যাব, কম্পিউটারে বেশি রাত কাটানোর অভ্যাস। এটি যে কী পরিমাণে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হয়তো আমরা এখন বুঝতে পারছি না। কিন্তু সময়ে যখন বুঝব, হয়তো তখন আর কিছু করার থাকবে না।

একটি ভঙ্গুর সমাজ, মানসিক রোগীভরা একটি সমাজ বিশাল সংখ্যায় রাষ্ট্রের কল্যাণ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে উঠবে। আমাদের দেহে ঘড়ি আছে, যা সূর্যের সময়ের সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত। সেই ঘড়ির সময় অনুসারে রাত ৮টা থেকে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত হজম করার চুল্লি সচল থাকে, তারপর আস্তে আস্তে নিভে যায়। গভীর রাতে খাবার খেলে সে খাবার শরীরের স্বয়ংক্রিয় হজম চুল্লি বন্ধ থাকার কারণে ঠিকমতো হজম না হয়ে পাকস্থলীতে পচতে থাকে। ফলাফল হলো স্বাস্থ্যহীনতা, ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া, হজমের গণ্ডগোল থেকে ক্রমিক আইবিএসে রূপ নেয় আর যার চিকিৎসা অনেক জটিল। লাইফস্টাইল পরিবর্তন ছাড়া এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বন্ধ। এতে যারা আক্রান্ত হন, তাদের মানসিক বিপর্যয় ছাড়াও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জীবন যাপন করতে হয়। রাতে শরীর কোনো কিছু গ্রহণ করার কাজ করে না বরং ত্যাগ করার কাজ করে, যেমন রাত ১১টা থেকে লিভার তার কাছে জমে থাকা বর্জ্য বা টক্সিন অটো ডিটক্সিফিকেশন করতে থাকে। রাত ১১টায় যদি আমরা ঘুমের মধ্যে না থাকি, তাহলে লিভার অটো ডিটক্সিফিকেশন করতে পারে না। এর ফলাফল হজমের গণ্ডগোল এবং ত্বকের রং কালো হয়ে যাওয়া।

তেমনি রাতে হার্ট, ফুসফুস, গলব্লাডার, পাকস্থলী, কিডনি অটো ডিটক্সিফিকেশন করতে থাকে। যদি আমরা না ঘুমাই, তখন শরীর অটোডিটক্সিফিকেশন করতে পারে না। পরিণতিতে শরীরের টক্সিন না বেরিয়ে শরীরে থেকে যায়, যা আমাদের স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ব্যাহত করে। এতে শেষ পর্যন্ত শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগের উপসর্গ তৈরি হয়। যার ফলে মৃত্যু হওয়ার অসম্ভব কিছু নয়।

এর থেকে মুক্তি পেতে সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুক্ত বাতাসে হাঁটলে নির্মল বায়ু পাওয়া যায়, যা সকালে ওজনস্তরে থাকে বলে বলে হালকা থাকে। সে বায়ু থেকে শ্বাস নিলে শরীরে অক্সিজেন প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। শরীরের ভেতরে অক্সিজেন নিজেই অনেক বিচ্যুতি দূর করে দেয়। ভোরের আলো ভিটামিন ডি ভরা। সকালের সূর্যকিরণ শরীরে হাড় মজবুত করে, শরীরে কোনো ধরনের ব্যথা হয় না। সকালে হাঁটতে পারলে শরীরের সব অর্গান সচল হয়। কায়িক পরিশ্রম শরীরে কোনো ধরনের চর্বি জমতে দেয় না ফলে ওজন বাড়ে না। ডায়াবেটিস হয় না। হার্টের সমস্যা হয় না, মস্তিষ্ক শক্তিশালী থাকে, কঠোর পরিশ্রমেও তা ঠিকমতো কাজ করে এবং স্মরণশক্তি অটুট থাকে। এছাড়াও দিনে কর্মঘণ্টা বেড়ে যায় এবং রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো সম্ভব হয়।

দেহ ঘড়ি ঠিক রাখুন : আমাদের দেহ ঘড়িকে সঠিক উপায়ে চলতে দেওয়ার জন্য সূর্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। রাত যেহেতু ঘুমানোর জন্য তাই ঘুমাতে হবে রাতে, দিনে জেগে থাকার জন্য, তাই জেগে থাকতে হবে, কর্মময় থাকতে হবে। এটাই সাধারণ সূত্র। রাত জাগার অভ্যাস পরিবর্তন করে সকালে ঘুম থেকে উঠে কর্মময় হওয়ার অভ্যাস গড়লে শরীর ভালো থাকবে এবং অনেক কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে। তাই রাতকে ঘুমানোর জন্য রেখে সকালে কর্মময় থাকুন।

ভারতের সভাপতিত্বে সফল জি-২০ সম্মেলনে এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

আনন্দ মোহন দাস

সম্প্রতি ৯, ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের সভাপতিত্বে দিল্লিতে জি-২০ সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিদের সম্মেলন হয়ে গেল। এবারের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও পরম্পরার উন্মেষ ঘটেছে। এর আগেও কংগ্রেসের শাসনকালে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন-সহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভারতে হয়েছে কিন্তু কংগ্রেস নেহেরু-গান্ধী পরিবারের সংস্কৃতির বাইরে, দেশের সংস্কৃতিকে কখনো প্রাধান্য দেয়নি। সেই ধারার পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ব সমস্যা সমাধানে জি-২০ ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে তাঁরই মন্ত্র 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস'কে সামনে রেখে সকলকে প্রোৎসাহিত করেছেন। সকলের সামনে রেখেছেন ভারতীয় সভ্যতার মূল কথা— 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা (সত্য এক, বিদ্বানরা আলাদা আলাদাভাবে ব্যক্ত করেন), সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ (সবাই সুখি হোক) এবং বসুধৈব কুটম্বকম্ (পুরো বিশ্ব একটি পরিবার) যা মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রসঙ্গত, জি-২০ হলো ২০টি দেশের একটি গ্রুপ যারা ১৯৯৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর প্রথম মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যবসা বাণিজ্য ত্বরান্বিত করতে এবং বেকারত্ব, আর্থিক সমস্যা দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এই গ্রুপে উন্নত, কম উন্নত ও বিকাশশীল দেশগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথমে সদস্য দেশগুলির অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় গভর্নররা সম্মেলনে যোগ দিতেন। কিন্তু আরও বেশি কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ২০০৮ সাল থেকে সদস্য দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

জি-২০ দেশগুলি হলো : (১) আর্জেন্টিনা, (২) অস্ট্রেলিয়া, (৩) ব্রাজিল, (৪) কানাডা, (৫) চীন, (৬) ফ্রান্স, (৭) জার্মানি, (৮) ভারত, (৯) ইন্দোনেশিয়া, (১০) ইতালি, (১১) জাপান, (১২) দক্ষিণ কোরিয়া, (১৩) মেক্সিকো, (১৪) রাশিয়া, (১৫) দক্ষিণ আফ্রিকা, (১৬) তুর্কি, (১৭) সৌদি আরব, (১৮) ইংল্যান্ড, (১৯) আমেরিকা, (২০) ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এই বছর আফ্রিকান ইউনিয়ন এই গ্রুপে সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়ে জি-২১ হয়ে গেল। আগামী বছর গ্রুপের সম্মেলন ব্রাজিলে।

বলাবাহুল্য বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা এই দেশগুলির মধ্যে

রয়েছে। বিশ্বের ৮৫ শতাংশ জিডিপি এই দেশগুলির সম্মিলিত জিডিপির সমান এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রায় ৭৫ শতাংশের বেশি ব্যবসা সদস্য দেশগুলির মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এই দেশগুলির শীর্ষ প্রধানদের ভারতে এক জায়গায় মিলিত হয়ে বিশ্বের আর্থিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ভারতের সভাপতিত্বে এবারের জি-২০-র পক্ষ থেকে সারা দেশে ৬০টি শহরে ২২০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১১৫টি দেশ থেকে প্রায় ২৫০০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে ভারতের পর্যটন শিল্পে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর সরকার এই বিশাল কার্যসূচি সফল করার জন্য অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। আজকের প্রতিবেদনে আর্থিক চুক্তির বাহিরে এই সম্মেলন থেকে ভারত কতটা লাভবান হলো তাই আলোচ্য বিষয়। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে আর্থিক বিষয় ছাড়াও ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও পরম্পরার এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটল। ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক 'অতিথি দেবো ভবঃ' মন্ত্রে সম্মেলনে আগত সমস্ত শীর্ষ নেতা-নেত্রীদের খাদি অঙ্গবস্ত্র-সহ ভারতীয় প্রথায় স্বাগত জানানো হলো। ভারতের সভাপতিত্বে ২০২৩-এ জি-২০ সম্মেলনের থিম ছিল 'বসুধৈব কুটম্বকম্' এবং লোগো ছিল পদ্মফুল।

অর্থাৎ এক পৃথিবী এক পরিবার যা ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। সকলকে আপন করে নেওয়ার ভাবনা ভারতীয় সভ্যতার মূল লক্ষ্য। সেই অর্থে এবারের থিম 'বসুধৈব কটুম্বকম্' হলো হিন্দু সংস্কৃতির যথার্থ প্রতিফলন। দিল্লির এই মহাসম্মেলনে ১৮টি দেশের (চীন, রাশিয়া অনুপস্থিত) রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিতে সম্মেলনের স্থানের নাম সংস্কৃত ভাষায় 'ভারত মণ্ডপম্' রাখা হয়েছিল যা সাংস্কৃতিক করিডর হিসেবে চিহ্নিত ছিল এবং মণ্ডপের প্রবেশ পথের সামনে ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক ২৮ ফুটের একটি নটরাজের বিশাল মূর্তি বিরাজমান ছিল। ভারতের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের উল্লেখে মণ্ডপের নামকরণ হয়েছে এবং সনাতন সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসেবে নটরাজের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। বিশ্বের দরবারের ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও পরম্পরার উপযুক্ত ব্যবহার নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার গর্বের সঙ্গে এই সম্মেলনে করেছে। এই আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলনে এই প্রথম সর্বত্র দেশের নাম ভারত ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও বিদেশিদের দেওয়া নাম ইন্ডিয়ার ব্যবহার হয়নি।

খাওয়ার তালিকাতেও ভারতীয় ডিসের প্রাধান্য

এই নৈশভোজে ভারতীয় খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য নৈশভোজে আগত বিভিন্ন অতিথিদের জন্য পরিবেশিত হয়েছিল বাজরার রুটি, দেশি রুটি, কাশ্মীরি কাহওয়া (হার্বাল পানীয়), মশলা চাটনি, শাকের সবজি, বন্য মাশরুম, পোলাও, কেরালার চালের ভাত, মুম্বাইয়ের 'পাও', বাকরখানি প্রভৃতি সরবরাহ করা হয়েছিল। তাছাড়া সাধারণ কফি, বিশুদ্ধ কফি এবং দার্জিলিং চায়ের ব্যবস্থাও ছিল। সর্বস্তরে ভারতীয়ত্বের ছাপ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদীর সরকার।

কোনো স্বাভিমানসম্পন্ন দেশকে বিদেশি দাসত্বের চিহ্ন বহন করে চলে না, তারই পরিচয় আমরা এই সম্মেলনে প্রত্যক্ষ করেছি। ভারতীয়ত্বকে বিশ্বের দরবারে কীভাবে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরা যায় তা নরেন্দ্র মোদীর সরকার যথার্থভাবে করে দেখিয়েছে।

এই সম্মেলনে আগত শীর্ষ নেতাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণ পত্রে আমন্ত্রণকারী হিসেবে প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়ার পরিবর্তে 'প্রেসিডেন্ট অব ভারত' লেখা হয়েছে। প্রাইম মিনিস্টার অব ইন্ডিয়ার পরিবর্তে 'প্রাইম মিনিস্টার অব ভারত' উল্লেখিত হয়েছে। পোডিয়াম, টেবিল-সহ বিভিন্ন জায়গায় নেমপ্লেটে সর্বত্র দেশের নাম 'ভারত' ব্যবহার করা হয়েছে যা অতীতে সরকারিভাবে ইন্ডিয়া ব্যবহৃত হতো। এর থেকে বোঝা যায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিকতা কী রয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই সম্মেলনে দেশ হিসেবে কোথাও বিদেশি শব্দ 'ইন্ডিয়া' ব্যবহার হয়নি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সরকারি অফিসারদের পরিচয়পত্রে 'ভারতীয় অফিসিয়ালস' হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। জি-২০ সম্মেলনে দেশ হিসেবে 'ভারত' নামের পরিচয় ব্যাপকভাবে বিশ্বের সকলের কাছে পৌঁছে গেছে। ভারতের কাছে জি-২০ সভাপতিত্ব কেবলমাত্র উচ্চস্তরীয় কোনো কূটনৈতিক প্রয়াস নয়, গণতন্ত্রের জননী এবং বৈচিত্র্যের আদর্শ ভূমি হিসেবে ভারত সরকার তার অভিজ্ঞতার দরজা সারা বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এর আগে কোনো দেশের সভাপতিত্বে এতো বিপুল ভৌগোলিক বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন করা হয়নি। মোদীর সভাপতিত্বে জি-২০ সম্মেলন বিশ্বের কাছে তুলে ধরল, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'

এবারের সম্মেলনে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ভারতীয় শিল্পকলা, প্রাচীন কারুকার্য, হস্তশিল্প ও পোশাক পরিচ্ছদের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শন। শিল্পের গুণবত্তা ও নিপুণতায় ভারতীয়রা যে কত উন্নত তা শিল্পকলায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ভারতীয় পণ্যের গুণগত মানকে বিশ্বের দরবারে উন্মুক্ত করে বাণিজ্যের জন্য পথ খুলে দেওয়া। বিদেশি অভ্যাগতদের ভারতীয় শাড়ি, কুর্তা-চুড়িদার ও মোদী জ্যাকেট উপহার স্বরূপ প্রদান করে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় হস্তশিল্পকে তুলে ধরেছেন। এমনকী ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আহ্বানে ভারতমণ্ডপমে নৈশভোজে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের অনেকে ভারতীয় পোশাকে হাজির ছিলেন। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীণ জগন্নাথ পরেছিলেন ভারতীয় পোশাক বাঁধগলা (রাজস্থানী গলবন্ধ কোট)। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মিলোনির পরনে ছিল তাঁর গাউন ও ভারতীয় শিল্পীদের কাজকরা ওড়না। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক্রিস্টালিনা জর্জিভা গোলাপি রঙের কুর্তা পাজামা এবং তাঁর ডেপুটি গীতা গোপীনাথ পরেছিলেন নীল রঙের শাড়ি। বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যানের স্ত্রী রিতু বাংগার পরনে ছিল সোনালি মোতির কাজ করা চান্দেরি শাড়ি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পরনে ছিল জরির কাজ করা সাদা বেনারসি শাড়ি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরেছিলেন বেনারসের তাঁতের জামদানি শাড়ি। ভারতীয় মহিলা অফিসাররা সকলেই ভারতীয় শাড়ি পরিধান করে

স্বদেশি শিল্পকে মর্যাদা দিয়েছেন। বিশ্বের বেশিরভাগ শীর্ষ নেতাদের স্ত্রীরাও ভারতীয় পোশাক পরিধান করে নৈশভোজে অংশ নিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের স্ত্রী পরেছিলেন জরির কাজ করা সবুজ পাড় ও গোলাপি রঙের সিল্কের শাড়ি। জাপানি প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর পরনে ছিল গোলাপি রঙের ভারতীয় সিল্কের শাড়ি। তিনি কপালে টিপ লাগিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন। এই সম্মেলনে পোশাক পরিচ্ছদের কদর বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রেসিডেন্টের দেওয়া নৈশভোজের আসরে সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির পরিচালনায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে 'ভারত বাদ্য দর্শনম্' নামে একটি মনোরম যন্ত্র সংগীতের আসর বসে। তাছাড়া ৭৮ জন যন্ত্র সংগীতবিদদের নিয়ে 'গন্ধর্ব অতোদ্যম' নামে একটি দল ৯২টি সংগীত যন্ত্রের মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন করেন। এর মধ্যে ৩৪টি হিন্দুস্তানি উচ্চাঙ্গ সংগীতের যন্ত্র, ১৮টি দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের যন্ত্র, ৪০টি লোক সংগীতের যন্ত্র-সহ কিছু বিরল সংগীত যন্ত্র সুরবাহার, জলতরঙ্গ, নলতরঙ্গ, বিচিত্র বীণা, রুদ্র বীণা, সরস্বতী বীণা, ধাংগলী, সুন্দরী, ভাপাংগ এবং দিলরুবা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহারে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের চিরাচরিত সংগীত, লোকগীতি, লোকনৃত্য-সহ সান্ধ্যকালীন হিন্দুস্তানি রাগ এবং দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশিত হয় যা বিদেশি অতিথিদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক ও তাঁর স্ত্রী মঞ্চে উঠে বিশেষ ভাবে সুন্দর অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানের শেষে জাতীয় সংহতির উপর ভীম সেন যোশীর বিখ্যাত সংগীত ১৪টি ভারতীয় ভাষায় 'মিলে সুর মেরা তুমহারা' বাজানো হয় যা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবনা প্রদর্শিত হয়।

এই সম্মেলনের সাজসজ্জাতেও ভারতীয় পরম্পরা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেছে যা এককথায় অতুলনীয়। এই সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ হলো কোনারকের সূর্যমন্দিরের ঐতিহাসিক চক্রের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তরফে অন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের অভ্যর্থনা এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে অভ্যর্থনাপর্বে মোদীজীর পক্ষে বাইডেনকে নালন্দার প্রতিকৃতির সঙ্গে পরিচিতি। ভারতমণ্ডপম্ ছাড়াও অন্যান্য বৈঠকের কেন্দ্র হিসেবে হায়দরাবাদ হাউসের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন লোককল্যাণ মার্গকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, যা বহন করেছে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বে এক বিশ্ব-এক পরিবারের বার্তা। এই সম্মেলনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন আগত বিদেশি অতিথিদের একটি জি-২০ বুকলেট দেওয়া হয়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'Bharat, The Mother of Democracy', যেখানে উল্লেখিত হয়েছে, দেশের সরকারি নাম হলো ভারত, যা ভারতের সংবিধান ও গণপরিষদেও তার স্বীকৃতি রয়েছে। পরিশেষে অবশ্যই বলা যায় ভারতের সভাপতিত্বে এবারের জি-২০ সম্মেলন ছিল এককথায় ঐতিহাসিক। নরেন্দ্র মোদীর যোগ্য নেতৃত্বে ২০টি দেশের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হওয়া একটি সফল সম্মেলনের পরিচায়ক। তাছাড়া বিশ্বগুরু হিসেবে ভারতের দাবি যেমন জোরালো হয়েছে, সেরকম ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রতিফলন সম্মেলনে দেখা গেছে। তার ফলে দেশের গৌরব, মানমর্যাদা বিশ্বের দরবারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ■

ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতি আস্থা প্রদর্শন

এবারের জি-২০ সম্মেলনে উপস্থিত শীর্ষ নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল হিন্দু সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতি আস্থা প্রদর্শন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি

সুনক ও তাঁর স্ত্রী অক্ষতা মূর্তির দিল্লির অক্ষরধাম স্বামীনারায়ণ মন্দির দর্শন এবং সেখানে পূজা অর্চনায় মগ্ন হওয়া। অক্ষরধাম মন্দিরের ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের তরফে ছয়জন পুরোহিত ঠিক সকাল ৬-৩০ মিনিটে ভারতীয় প্রথায় বিদেশি অতিথিদের ভব্য স্বাগত জানালেন এবং মন্দির পরিসর ঘুরিয়ে দেখালেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী অক্ষতা স্নান করে সাধারণ পোশাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পূজা অর্চনা করলেন। হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি গভীর আস্থা রেখে মন্দিরে তাঁরা প্রায় ৫০ মিনিট থাকলেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁরা রেখে গেলেন। তিনি সম্প্রতি ব্রিটেনে মুরারি বাপুর প্রবচনে অংশ নিয়ে বলেছিলেন, তিনি হিন্দুভক্ত হিসেবে এসেছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়। তিনি সেখানে জয় সিয়ারাম ধ্বনিও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ঋষি সুনক নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দু হিসেবে পরিচয় দেন এবং হিন্দু পরম্পরা অনুসারে ২০১৫ সালে তিনি ভগবত গীতা হাতে নিয়ে এমপি হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শপথ নিয়েছিলেন এবং তাঁর অফিসের টেবিলে সর্বদা একটি ভগবান গণেশের মূর্তি বিরাজমান থাকে। যাঁরা সনাতন সংস্কৃতির বিনাশ সাধন বা হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বংস কামনা করেন তাদের উচিত শিক্ষা তিনি দিয়ে গেলেন। হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আস্থা প্রমাণ দেয়, বিদেশেও সনাতন সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা কম নয়।

জি-২০ সম্মেলন
নতুন শতাব্দীর পথে ভারত

দীপ্তাস্য যশ

সদ্য শেষ হয়ে যাওয়া জি-২০ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে একটি প্রশ্ন বারে বারেই উঠে এসেছে, এই সম্মেলনে ভারতের লাভ কী হলো? বিরোধী রাজনৈতিক দল, সাধারণ মানুষ প্রত্যেকের মনেই এই প্রশ্ন নানাভাবে উঠে এসেছে। সম্মেলনের স্বাক্ষরিত একটি মউ খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে এই সম্মেলনে ভারতের লাভ কী হতে পারে।

এই সম্মেলনে ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালির মধ্যে নতুন একটি ইকোনমিক করিডোর সংক্রান্ত একটি চুক্তি সই রয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে, 'India-Middle East-Europe Economic Corridor বা IMEEC।

এই চুক্তিকে যদি এক কথায় ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে বলতে হয় সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনকে হাতিয়ার করে এটি ভারতের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক মাস্টারস্ট্রোক। কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা বারেবারেই বলেছেন ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব কোনো বিশেষ ঘটনা নয়, যেহেতু এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশকেই একবার করে সুযোগ দেওয়া হয় সভাপতিত্বের জন্য। ঠিক কথা, কিন্তু সেই সভাপতিত্বকে কোন দেশ কীভাবে কাজে লাগাচ্ছে তার উপরেই নির্ভর করে সেই দেশের সাফল্য। ঠিক যেমন ভারত এই মঞ্চের মাধ্যমে IMEEC-র ঘোষণা করে একদিকে যেমন বিশ্ব বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং ভূ-রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে অন্য দেশগুলির থেকে, তেমনিই আগামীদিনে নিজেকে বিশ্বরাজনীতিতে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই জি-২০ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রতিনিধিত্ব করেন 'গ্লোবাল সাউথের'।

আইএমই করিডোর মূলত ভারত এবং ভারত মহাসাগর অঞ্চলের বাণিজ্যিক পিভট পয়েন্টের ভূমিকা পালন করবে। মহামারী পরবর্তী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব পরবর্তী

বিশ্বে বিভিন্ন দেশ খাদ্য, শক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সরবরাহে বিভিন্ন বাধার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক। আইএমই করিডোর এশিয়া-ইউরোপ বাণিজ্য-পথের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে করিডোরটি মূলত আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্য-প্রাচ্যকে ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত করবে এবং ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকার সঙ্গে ট্রান্স-আটলান্টিক রুটের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের এক নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। ভারত হলো এই বিশাল সংযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

বস্তুত এই ইকোনমিক করিডোর নরেন্দ্র মোদী যে আগামীর ভারতকে বিশ্বগুরুর স্থানে নিয়ে যেতে চান সেই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের একটি উদাহরণ। একদিকে যেমন আশিয়ান অর্থাৎ মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স ইত্যাদি দেশগুলির সঙ্গে আগেই ভারত বিভিন্ন বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করেছে, অন্যদিকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে ভারত মহাসাগরের অন্যতম ট্রানজিট পয়েন্টে পরিণত করার কাজটি অনেকখানিই এগিয়ে গেছে। এর ফলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ আফ্রিকা থেকে প্রথমে পণ্য সরবরাহ করবে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ট্রানজিট পয়েন্টে, সেখান থেকে তা আসবে ভারতের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে বা চলে যাবে দুবাই হয়ে ইউরোপে। কাঁচামাল থেকে ভারতে উৎপাদিত পণ্য পাড়ি দেবে পশ্চিমভারতের বন্দরগুলিতে। সেখান থেকে দুবাই হয়ে হাইফা বন্দরের মাধ্যমে চলে যাবে ইউরোপে। আবার ইউরোপ থেকে সেই পণ্য পাড়ি দেবে উত্তর আমেরিকায়।

এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু নীরব সহযোগী হলো ইজরায়েল। প্রস্তাবিত এই ইকোনমিক করিডোরের মাধ্যমে প্রথমে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন বন্দর থেকে মাল পরিবহণ করা হবে দুবাইতে। দুবাই থেকে তা রেলপথের মাধমে চলে যাবে ইজরায়েলের হাইফা বন্দরে। হাইফা বন্দর থেকে পাড়ি দেবে গ্রিস বা ইতালির বন্দরে। পরিকল্পিত পরিকাঠামোর প্রকৃতিই এই প্রকল্পের গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে। রেল ও পাইপলাইন পরিকাঠামো সুয়েজ খালকে বাইপাস করতে সাহায্য করবে, যার ফলে ভারত মহাসাগর এবং ইউরোপের মধ্যে দ্রব্য পরিবহণের সময় ৪০ শতাংশ কম লাগবে।

আমাদের দেশের বামপন্থীদের একটি খুব প্রিয় মশকরার বিষয় হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ যাত্রা। যদিও ভারতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশ যাবেন এবং ঘনঘনই যাবেন এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের দেশের বামপন্থীদের মতে তা অস্বাভাবিক। আশা করি এবার তারা বুঝবেন, কেন ঠিক জি-২০ সম্মেলনের আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রিস গেছিলেন। আর যারা ইতালির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা দেখে অবাক হচ্ছেন তারাও আশা করি এবার উত্তর পেলেন কেন এই ঘনিষ্ঠতা। এই সম্মেলনেই ইতালি চীনকে জানিয়ে দিয়েছে তারা আর চীনের সঙ্গে ‘ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড’ প্রকল্পে আগ্রহী নয়। কারণ ভারতের প্রস্তাবিত ইকোনমিক করিডোরটির ক্ষেত্রে আর্থিক দায়ভারের পরিমাণ বাণিজ্য সম্ভাবনার পরিমাণের তুলনায় বহুলাংশে কম।

এই ইকোনমিক করিডোর ধরে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ভারত ইউরোপে বাণিজ্যিকভাবে সরবরাহ করতে পারবে। বস্তুত আগামীদিনে মিলেট বা জোয়ার, বাজরা, গমের ইউরোপীয় বাজারে আধিপত্য বিস্তার ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। সেই কারণেই এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি যে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন সেই আয়োজনে প্রতিটি উপকরণই মিলেটের উপকরণ ছিল। ভারতীয় মিলেটের বিজ্ঞাপনই এই মেনুর লক্ষ্য। একই ভাবে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রাংশ অনেক কম খরচে ভারত ইউরোপে পাঠাতে পারবে।

বস্তুত এই ইকোনমিক করিডোর ভারতের একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক পরিকল্পনারই অঙ্গ। একদিকে যেমন ইলেক্টনিক ইন্ড্রাস্ট্রিতে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে কিছুদিন আগেই সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ভিত্তিক প্রকল্পগুলির জন্য প্রায় ৫০ শতাংশ সাবসিডির ঘোষণা করেছে, তেমনই রয়েছে প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি প্রকল্প, যার ফলে ভারতের অন্তর্দেশীয় সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং দ্রব্য পরিবহণের খরচ কমবে। সব মিলিয়ে একটি শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি

ফঃ ৪

হবে। যে কারণে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির ভারতে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই ভারত মোবাইল উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়।

একইভাবে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা যেমন ইজরায়েল ও আরবের দেশগুলির মধ্যেকার দূরত্ব কমিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে চীনের গতিরোধ করতে চাইছে, ভারতও একইভাবে রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে পশ্চিমি বিশ্বের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে নিজের বাণিজ্যিক ও সামরিক সুরক্ষার দিকটি নিশ্চিত করতে চাইছে। সেই কারণেই কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আইএমই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই সম্ভাবনা আগামী চার-পাঁচ বছরেই ভারত পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নেবে, যাতে চীন 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্পের বিস্তারের মাধ্যমে ভারতের রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে নর্থ সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডোরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করতে পারে। নর্থ সাউথ করিডোর মধ্যপ্রাচ্য এবং রাশিয়া থেকে তেল ও শক্তি সম্পদ ভারতে আমদানির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বালুচিস্তান কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এক্ষেত্রে হয়তো প্রশ্ন উঠবে চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্প যখন ইতিমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে সেক্ষেত্রে কেন এই নতুন ইকোনমিক করিডোর গুরুত্ব পাবে বিভিন্ন দেশের কাছে?

প্রথমত, ভারতের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশ এবং বিনিয়োগকারীদের অনেক বেশি ভরসা জোগাতে সক্ষম চীনের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার তুলনায়। দ্বিতীয়ত 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ, যেমন শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ এই প্রকল্পে যেভাবে চীনের ঋণের ফাঁদে পড়েছে তাও পুরো বিশ্বের কাছে আশঙ্কার কারণ। ঠিক এই কারণেই ভারত আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-র স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। এর ফলে আগামীদিনে এই দেশগুলিকে চীন কোনোরকম জোর জুলুম করতে পারবে না ঋণের টাকা আদায়ের জন্য। বস্তুত বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্পের জন্যই না চীন আর্থিক মন্দাবস্থার সম্মুখীন হয়। সেই সঙ্গে সামরিক সুরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও জড়িত সাউথ চায়না সি সংলগ্ন দেশগুলি এবং জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলির কাছে।

সদ্য সমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনে সাধারণ মানুষের লাভ কী হবে। এই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন ভারতের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে, ভারতকে বিনিয়োগকারীদের প্রধান গন্তব্যে রূপান্তরিত করবে। এর ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্র বাড়বে। অর্থনীতিতে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তি ঘটবে। খুবই স্বাভাবিক এর ফলে দেশের দারিদ্র্যের চিত্রও উন্নত হবে। এই করিডোর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও নানা সুযোগ তৈরি করবে এবং ভারতের অর্থনীতিকে ভবিষ্যতে এক নম্বরে উঠে আসতে সাহায্য করবে। এই করিডোর যে শুধুমাত্র খাদ্য দ্রব্য বা ইলেক্ট্রনিক প্রোডাক্ট বা যন্ত্রাংশের রপ্তানির প্রধান পথ হবে তাই নয় বা শুধুমাত্র কেবল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহণের বিকল্প পরিকাঠামোর জোগান দেবে তাই নয়, প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে হয়তো এই পথই গ্রিন হাইড্রোজেন সরবরাহের অন্যতম মাধ্যম হবে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে হয়তো এই পথই গ্রিন হাইড্রোজেন সরবরাহের অন্যতম মাধ্যম হবে। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে হয়তো দেখা যাবে একদিন এই পথেই ভারত এবং মধ্য প্রাচ্য থেকে সৌর শক্তি সরবরাহ হচ্ছে ইউরোপে। হয়তো দেখা গেল ভবিষ্যতে ইউরোপে সৌরশক্তি রপ্তানিই ভারতের অর্থনীতির অন্যতম মূল ভিত্তিতে পরিণত হলো। এই ইকোনমিক করিডোরের সঙ্গে ভারতের নিজস্ব প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি প্রকল্প, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডআপ ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়ার মতো প্রকল্পগুলি আগামীদিনে ভারতকে বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্যে রূপান্তরিত করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম জি-২০ নিয়ে কীভাবে আলোচনা করছে? কারণ এই যে একের পর এক চুক্তি তার বিন্দুমাত্র লাভ কি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অপশাসনের যুগে পশ্চিমবঙ্গবাসী পাবে? যে রাজ্যে পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন রেল প্রকল্প আটকে পড়ে থাকে শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের জমি অধিগ্রহণের অনীহার কারণে, সেই রাজ্য কীভাবে এই সুযোগ নেবে? অথচ সুযোগ অনেক ছিল। কিন্তু আমরা তো এতদিন এই রাজ্যকে ভেনিস, লন্ডন বানাতে ব্যস্ত ছিলাম আর এখন যাচ্ছি স্পেনে বিনিয়োগের খোঁজে। যে স্পেনের নিজের অর্থনীতিই ধুঁকছে। অবশ্য কুলোকেরা বলছে, স্পেন থেকে বিনিয়োগ আনতে নয়, বিনিয়োগ করতেই সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রীর এই যাত্রা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমে তাতে কী যায় আসে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর দয়ায় স্পেন ঘুরতে পেরেই ধন্য। এখন তাই পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমে যাবতীয় উন্মাদনা স্পেনকে ঘিরে। অথচ এখন পর্যন্ত ফুটবল অ্যাকাডেমি ছাড়া আর একটি বিনিয়োগেরও সন্ধান সংবাদমাধ্যম আমাদের দিতে পারল না। প্রশ্ন জাগে, চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনে এরকম কটি ফুটবল অ্যাকাডেমির মউ চুক্তি হয়েছিল আর তার কটির বাস্তবায়ন হয়েছে? বরং দেখা যাচ্ছে প্রতি বছর যত ঘটা করে বিশ্ববাণিজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

ভয় হয় একদিকে যখন বাকি ভারত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলেছে আমরা হয়তো অপশাসন ও নীতিপঙ্গুতার জেরে ক্রমশ পিছোতে পিছোতে 'পেছনের দিকে এগিয়ে যান' বাক্যটিরই স্বার্থকরূপ প্রদান করছি। বাকি ভারত যখন এই শতাব্দীর অন্যতম সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ আরও অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। বাকি ভারত যখন শতাব্দীর নতুন শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হতে চলেছে, তখন আমরা ক্রমশ এক বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হতে চলেছি। ■

বাঁকুড়া নগরে সঙ্ঘের ইতিহাস পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ২৯ আগস্ট বাঁকুড়া নগরের রামপুরস্থ লতা প্যালেসে স্বয়ংসেবকদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে **বাঁকুড়া জেলার সঙ্ঘের ইতিহাস** পুস্তকটি এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, বাঁকুড়া জেলার সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নবতিপর বাসুদেব চন্দ্র। উপস্থিত ছিলেন অবনীভূষণ মণ্ডল, মোহন চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজদীপ মিশ্র, বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার লায়েক, উত্তম মণ্ডল, কাজল বরণ সিংহ, জয়ন্ত শীল, অশোক কুমার গোপ-সহ বাঁকুড়া জেলার বহু স্বয়ংসেবক।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী মৌমিতা মুখোপাধ্যায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। একক গীত পরিবেশন করেন প্রলয় শীট। পুস্তক উন্মোচন করে শ্রীদত্ত এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এবং সঙ্ঘকাজ সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বহরমপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস পালন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থাপনা দিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশের সঙ্গে বহরমপুর নগরেও একাধিক স্থানে অনুষ্ঠান হয়। ৭ সেপ্টেম্বর পরিষদ কার্যালয়ে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। জেলার সব কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। শেষে ৭০ জন প্রসাদ গ্রহণ করেন। ৮ তারিখে সুতির মাঠ, মধুপুর, গোরাবাজার; ৯ তারিখে সিদ্ধিপাড়া নারায়ণ মন্দিরে অনুষ্ঠান হয়।

সবকটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার। কয়েকটি স্থানে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি কৃষ্ণেন্দু সরকার, জেলা সম্পাদক সন্তোষ সূত্রধর। সবকটি অনুষ্ঠানে মায়েরা ভালো সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

গাজোলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান

গত ১০ সেপ্টেম্বর মালদা জেলার গাজোল প্রখণ্ডের বলরামপুর রবিদাস পাড়াতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে সামাজিক সমরসতা অভিযান এবং সেবা বিভাগের উদ্যোগে ৩১ জন গরিব ছাত্র-ছাত্রীকে খাতা-কলম প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা এবং অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা অভিযান প্রমুখ গৌতম সরকার। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সমিতির সদস্য নিখিল মজুমদার, প্রখণ্ডের সহ সভাপতি এবং অন্যান্য কার্যকর্তা। গৌতম সরকার ঘোষণা করেন যারা আগামী পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করবে তাদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রখণ্ড সম্পাদক তথা জেলা সেবা প্রমুখ অনুপম গোস্বামী। প্রসাদ বিতরণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ফারাক্কা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে গঙ্গা সমগ্র'র প্রান্ত অভ্যাস বর্গ

গঙ্গা সমগ্র হলো সর্বভারতীয় একটি সংগঠন যার লক্ষ্য অবিরল গঙ্গা এবং নির্মল গঙ্গা। অর্থাৎ গঙ্গানদীকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখা। এই লক্ষ্যেই গত ২ ও ৩ সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে একটি অভ্যাস বর্গ অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন গঙ্গা সমগ্রের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক রামাশিসজী, ফারাক্কার বিশিষটি চিকিৎসক শৈলেন্দ্র কুমার ঠাকুর এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। পশ্চিমবঙ্গের ১৫ জন কার্যকর্তা বর্গে অংশগ্রহণ করেন।

গঙ্গারামপুর শিশু মন্দিরে জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপন

গত ৬ সেপ্টেম্বর প্রতি বছরের মতো এবারও গঙ্গারামপুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও

ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্পণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শিশু মন্দিরের পূর্বতন প্রধানাচার্য বলরাম দাস এবং শিশু মন্দিরের সম্পাদক অনিলচন্দ্র বিশ্বাস।

শিশু মন্দিরের সকল ভাই-বোন কৃষ্ণ সেজে তাদের মায়েদের সঙ্গে শিশু মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। তারপর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বীরত্বপূর্ণ কাহিনি বর্ণনা করেন শিশু মন্দিরের দাদাভাই কানাই পাল।

ওই মহামানব আসে

রবিব্রত ঘোষ

যে উপাধিটা তাঁর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সেই উপাধিটা তাঁর আগেও অনেকে পেয়েছেন এবং তাঁর পরেও অনেকে পেয়েছেন। তাঁরা সবাই স্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছেন। অথচ নামের পর পদবির বদলে উপাধিটা পাকাপাকিভাবে বসে গেছে। দুইয়ে মিলেমিশে এমন অবস্থা যে উপাধির কথা বললেই তাঁর কথাই মনে পড়ে।

তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সাবেকভাবে তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর উপাধি। বিরাট পড়াশোনা করার স্বীকৃতি। উপাধিটি অর্জন করেছিলেন। এই উপাধি অনেকে পেলেও বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর বলতে একজনই। তিনি বিখ্যাত সমাজসংস্কারক বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। তার চেয়েও বড়োকথা বললে বলতে হয় তিনি আমাদের অভিভাবক। তাঁর হাত ধরেই বঙ্গপ্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা, বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা, আপামর বাঙ্গালির আধুনিক হয়ে ওঠার সূচনা।

তিনি অন্য অনেকের মতোই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেছিলেন কিন্তু পাণ্ডিত্যের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে থাকেননি। পাণ্ডিত্য কেবলমাত্র তার মস্তিষ্ককে স্পর্শ করেনি, তা ধীরে ধীরে হৃদয়ে নেমে এসেছিল। যেটা অন্য পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে হয়নি। আর হৃদয়ে নেমে আসার দরুনই তিনি মানুষের দুঃখদুর্দশার কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। বিশেষত মহিলাদের অবস্থা খুব ভালোভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। আর তাতেই তিনি এগিয়ে এসেছিলেন নারী শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক সংস্কারে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করতে পেরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে যতি চিহ্নের উদ্ভাবক আর বাঙ্গালি মেয়েদের ক্ষেত্রে অসময়ে জীবনের যতি পড়ে যাওয়ার থেকে রক্ষাকর্তা।

অথচ পড়াশোনার ক্ষেত্রে ছাত্র হিসেবে তাঁর যে সাফল্য তাকে মূলধন খুব সহজেই মোটা মাইনের চাকরি পেতে পারতেন। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারতেন। একটা সময় সেই সুযোগ পেয়েও ছিলেন, কিন্তু সবকিছুকে তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ মোচন করার জন্য। যাত্রা শুরু হয়েছিল বিদ্যাসাগর হিসেবে আর শেষ হয়েছিল দয়ার সাগর বা করুণাসাগর হিসেবে। অথচ এ দীর্ঘ যাত্রাপথটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। মানুষ মালা নিয়ে তাকে বরণ করেনি। বরং প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি পদে-পদে তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো কবি তাঁকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মানুষ তাঁকে নিয়ে রসিকতা করেছেন। ক্ষোভে দুঃখে অনেক দূরে গিয়ে তাঁকে সেই সময়কার বিহারের কারমাটারে

আশ্রয় নিতে হয়েছে। পরিবার পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল না। পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করতে হয়েছে। তবু তাঁকে দমানো যায়নি। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় মন্তব্য করেছিলেন বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব দয়া নয়, বিদ্যা নয়, তাঁর অজেয় পৌরুষ। বিদ্যাসাগর আক্ষরিক অর্থেই সৈন্যহীন বিদ্রোহী। তিনি কাউকে ডাকেননি সঙ্গে, কাউকে পাননি, অথচ তিনি এককভাবে এগিয়ে চলেছিলেন। একবার কেউ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বিদ্যাসাগর এই কথা জানতে পেরে সোজা তার বাড়িতে গিয়ে হাজির—এইতো আমি এসে গেছি এবার আমাকে বধ করুন।

শিক্ষা সংস্কার বা বিধবা বিবাহ আন্দোলন কোনোটাতেই কিন্তু মানুষের সাহায্য পাননি। আক্ষরিক অর্থেই তিনি ছিলেন ওয়ান ম্যান আর্মি। একক প্রচেষ্টায় করেছেন আর এর বাইরে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে সমাজের সর্বস্তরের বৃহৎ সংখ্যক মানুষের।

বাঙ্গালির আধুনিকতার অগ্রদূত হয়েও বাঙ্গালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কিন্তু কখনোই বিসর্জন দেননি। আর দশটা মানুষের মতো বিদেশি পোশাক কখনো পরেননি। সারাটা জীবন কাটিয়েছেন ধুতি-চাদরে। আর আত্মসম্মানবোধ! কোথায় কোন ইংরেজ টেবিলের উপর পা তুলে তাঁকে অভ্যর্থনা করবেন, তিনিও তার উত্তর সেভাবেই দেবেন— এই আত্মসম্মানবোধ ও আত্মশ্রদ্ধা ছিল তাঁর প্রবল।

তিনি যে সময় জন্মেছেন সেই সময় বঙ্গপ্রদেশে দুটো ধারা ছিল। একটা উগ্র দক্ষিণপন্থী যারা ইংরেজি সভ্যতার প্রবল আক্রমণে দিশেহারা, যাবতীয় কিছু প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যেই তার একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দিয়ে তাকে যে কোনোভাবেই রক্ষা করার চেষ্টা করছে। আর দ্বিতীয় দল ইয়ং বেঙ্গলের মানুষ। ভারতীয় যে কোনও কিছুরই বিরোধী, ভাঙতে তৎপর। বিদ্যাসাগর তৃতীয় ধারার প্রবর্তন করলেন। ভারতীয় শাস্ত্রসংস্কৃতিকেই কাজে লাগালেন উন্নতির স্বার্থে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিলেন হিন্দুশাস্ত্রকে। পরাশর সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন নিজের বক্তব্যের সমর্থনে। সেখান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছিলেন স্বামী অনুদ্দেশ হলে, মারা গেলে, ক্লীব হলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করলে বা পতিত হলে স্ত্রীদের পুনর্বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

বিপুল পরিশ্রমে তিনি একটি প্রায় অসাধ্য সাধন করে ফেলেছিলেন মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। বালিকাদের বিদ্যালয় নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির দুই পাশে বিদ্যাসাগর মহানির্বাণতন্ত্রের একটি শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন নিজের হাতে--- 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানীয়াতি যত্নতঃ।' অর্থাৎ পুত্রের মতো কন্যাকেও যত্ন করে পালন করতে হবে এবং শিক্ষা দিতে হবে।

কেন এভাবে শাস্ত্রকে কাজে লাগালেন খুব সহজভাবে কারণটাকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাবে সেখানে তিনি লিখেছেন—'যদি যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করো তা হলে এতদ্দেশীয় লোক কখনোই কর্তব্যকর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যদি শাস্ত্রে কর্তব্যকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে তবেই তাহারা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসারে চলিতে পারেন। এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্রই সর্বপ্রধান প্রমাণ এবং শাস্ত্রসম্মত কর্মই সর্বতোভাবে কর্তব্যকর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। অতএব বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম তাহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।'

যখন শিক্ষা সংস্কারে হাত দিচ্ছেন সেই সময় একটি তুমুল আলোড়নের সময়। একদিকে হু হু করে আসছে ইংরেজি শিক্ষার প্রবল ঝড়। ইংরেজ শাসকেরা প্রশ্ন তুলছেন ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত বা আরবি, ফারসি শিখিয়ে কী লাভ হবে? কেন অর্থ ব্যয় করা হবে? কারণ ইংরেজ প্রশাসকরা সবসময়ই চাইবে তাদের দরকার কিছু ইংরেজি জানা কেরানি, যারা শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে তাদের প্রয়োজনটুকু মেটাতে চাইবে। ঠিক তার বিপরীত রাস্তায় হেঁটে বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে করে তুললেন অগ্রগতির বাহন। আধুনিকতার উন্মোচন করলেন দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে দিয়ে। ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য ছিল, 'ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিদ্যা অনুশীলনের ফলভোগী না হইলে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চির প্ররূঢ় সমূলে উন্মূলন হইবেক না। প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে সর্বসাধারণের বিদ্যা অনুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।'

এরপর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় বাংলামাধ্যম স্কুল স্থাপনই তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি।

মহিলাদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম সহানুভূতি। বিধবাবিবাহ দ্বিতীয় পুস্তকের শেষ দিকে তিনি লিখেছেন—'যে দেশের পুরুষ জাতির ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সতবিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে। যা খালি দুঃখে হা-হুতাশ করা নয়। '১৮৬৫ সালে বেথুন কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় একটি মেধাবী ছাত্রীকে তিনি আনন্দে সোনার হার উপহার দেন। আর এমএ পরীক্ষীয় উত্তীর্ণ প্রথম বাঙ্গালি নারী চন্দ্রমুখী বসুকে তিনি উপহার দিয়েছিলেন শেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলী।

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ একটি পর্যবেক্ষণ আছে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে, 'তার দেশের লোক যে যুগে আছেন বিদ্যাসাগর সেই যুগকে ছাড়িয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন এইটাই আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যবিদ্যার মধ্যে সম্মেলনের সেতুস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি নিজে সংস্কৃত সাহিত্যের পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান ইউরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।' যথার্থ অনুধাবন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে।

বিদ্যাসাগরই একমাত্র মানুষ যিনি সেই সময়ে আধুনিকতা এবং ঐতিহ্যকে একসঙ্গে বাঁধতে পেরেছিলেন। আমাদের বোঝাতে পেরেছিলেন আধুনিকতা ও ঐতিহ্য পরস্পর বিরোধী নয় , বরং পরস্পরের পরিপূরক। চিন্তায়-চেতনায় আধুনিক মানুষ হয়েও ঐতিহ্যে বাঙ্গালি হওয়া যায়। □

পাকিস্তানের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করছেন মা দুর্গা

হীরক কর

প্রতিবেশী শত্রুদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করছেন এক 'মাতা'। একবার নয়, বারবার। পাকিস্তানের আক্রমণের মুখে ঢাল হয়ে দাঁড়ান তিনি। রাজস্থানের থর মরুভূমির বুকে পাকিস্তান সীমান্তে তাঁর মন্দির। নাম তার তন্নোত মাতা। আসলে মা দুর্গারই অন্য এক রূপ। ভারতীয় সেনাবাহিনী পরম বিশ্বাসে এই তন্নোত মাতাকে মান্য করে। এই মন্দির ঘিরে রয়েছে অদ্ভুত বিশ্বাস আর লোকশ্রুতি।

সোনার কেল্লার শহর জয়সলমীর। সেখান থেকে ১২৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তান সীমান্তে লাঙ্গেওয়ালা বর্ডারে এই মন্দিরের অবস্থান। জয়সলমীর গিয়েছিলাম বন

বিভাগের কাজে, ড্রেজার্ট ন্যাশনাল পার্কে। সেখানেই ভারত সরকারের বন বিভাগের কর্তাদের কাছে এই মন্দিরের কথা শুনি। তাঁরাই বলেছিলেন, এতদূর এসেছেন যখন ঘুরে আসুন। তাই, সাত সকালে জয়সলমীর থেকে বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গী জয়পুর থেকে আসা গাড়ির সারথী পাপ্পুজী। ঘণ্টা আড়াইয়ের পথ। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গেলেই রাস্তার দু'পাশে চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। থরে থরে বালি সাজানো। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। বালির পাহাড়। দূরে দূরে কোথাও কোথাও কাঁটাগাছের ঝাড়। মাঝে মাঝে পথে উটের সারির দেখা। মনে পড়ে যাচ্ছিল রহস্যরোমাঞ্চ লেখক জটায়ুর বেশে সন্তোষ দত্তর সেই সংলাপ— 'উট কি কাঁটা বেছে খায়?'

পাপ্পুজী ততক্ষণে সিনেমার মতো যুদ্ধের ধারাবিবরণী দিতে শুরু করে দিয়েছেন। বলার ধরন এতটাই নিখুঁত, যে মনে হবে সেই ১৯৭১-এর যুদ্ধের সময় তিনি নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। অথচ, পাপ্পুজীর বয়স দেখে আন্দাজ করতে অসুবিধা হবে না ৭১-এ যুদ্ধের সময় জন্মই হয়নি তার। একেই বলে মৌখিক ইতিহাস। যা যুগের পর যুগ এক প্রজন্ম পেরিয়ে আর এক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। যাকে বলে জনশ্রুতি।

যতক্ষণ না রাস্তার দু'পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে উইন্ডমিলের দেখা পাওয়া গেল, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ধারাবিবরণী শুনে যেতে থাকলাম। বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরে সুদীর্ঘ স্তম্ভের ওপর বনবন করে ঘুরছে দুটো পাখা। হাওয়ার গতি কমে গেলে পাখা আস্তে আস্তে ঘোরে। আবার হাওয়ার তীব্রতা বাড়লে বেড়ে যায় পাখার ঘূর্ণন। টিভি ইন্টারনেট সম্পৃক্ত সময়ে স্কুলপড়ুয়া শিশুও জানে উইন্ডমিলের প্রযুক্তিতে কোনও জটিলতা নেই। হাওয়ার চাপে পাখা ঘোরে। আর পাখার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত জেনারেটর শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদন। তারপর তারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি পৌঁছে যায় পূর্বনির্ধারিত ব্যবহার ব্যবস্থায়। জয়সলমীরের উইন্ডফার্মের প্রতিটি উইন্ডমিল থেকে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিবহণ গ্রিডে সরাসরি ব্যবস্থা করা

হয়েছে। এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং বিশ্বের চতুর্থ কর্মক্ষম অনশোর উইন্ডফার্ম। অর্থাৎ সমুদ্র সৈকতে নয়।

২০০১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত নানান পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষমতার উইন্ড টারবাইন জেনারেটর একের পর এক সংস্থাপন করতে করতে এখন সম্মিলিতভাবে এখানকার নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৩০০ মেগাওয়াট। প্রথমদিকের এক একটি উইন্ডমিলের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩৫০ কিলোওয়াট। আর একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সংস্থাপিত প্রতিটি উইন্ড টারবাইন জেনারেটরের উৎপাদন ক্ষমতা ২.১ মেগাওয়াট।

তন্নোত যাওয়ার পথে জয়সলমীর জেলার অমরসাগর-বাদাবাগ- তেজুভা-সোদামাদা মৌজা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই বিশাল উইন্ড ফার্ম। গাড়িতে বসে রাস্তার দু'পাশে তাকিয়ে থাকলেই বুঝতে পারা যায় উইন্ডফার্মটি কত কিলোমিটার দীর্ঘ।

উইন্ডফার্মের একঘেয়েমি দেখতে দেখতে চোখ যখন শ্রান্ত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই সড়কের বাঁ পাশে এসে যাবে রামগড় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সংক্ষেপে আরজিটিপিপি নামেই বেশি পরিচিত। এটি একটি গ্যাসভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। রামগড় গ্যাস-থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট। রাজস্থানের রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন নিগমের এস বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা ২৭০.৫ মেগাওয়াট। জেলাসদর জয়সলমীর থেকে ৬০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে গ্যাস সরবরাহের জন্য গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের একটি টার্মিনাল রয়েছে। এছাড়াও সরকারের অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস করপোরেশন বা ওএনজিসি, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বেসরকারি সংস্থা ফোকাস অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস করপোরেশন বা ওএনজিসি, অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বেসরকারি সংস্থা ফোকাস এনার্জি লিমিটেড মূল টার্মিনালে গ্যাস সরবরাহ করে। ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য কর্মী মিলিয়ে কম-বেশি দুশো মানুষ এখানে কর্মরত। পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা তাঁদের আবাসন দেখে মনে হতেই পারে যে মরুপ্রান্তরে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে এক ছোট্টো শিল্পনগরী। জামসেদপুর বা দুর্গাপুরের আয়তনের তুলনায় নিতান্তই শহুরে-পাড়া। ১৯৯৪-এর ১৫ নভেম্বর এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদন শুরু করলেও প্রকল্প সংস্থাপনের জন্য তার বছর কয়েক আগেই কর্মসূত্রে এখানে বসবাস করতে থাকেন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী।

নব্বইয়ের দশকে উইন্ডফার্ম ও তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার আগে জয়সলমীর থেকে শুরু হওয়া শতাধিক কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তায় সামরিক বাহিনীর যানবাহন ছাড়া অন্য গাড়িঘোড়া চলাচল করত কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই সত্যজিৎ রায়ের হাল্লা আর শুন্ডির বিশাল সেনাবাহিনী মোতায়েনের উপযোগী এমন আদর্শ জায়গা আর কী হতে পারে!

রামগড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছাড়িয়ে আরও ৬৫ কিলোমিটার এগিয়ে গেলে দেখা যাবে তন্নোত মাতার আদি মন্দির। মানুষের বিশ্বাস, মামাদিয়া চরণের (গধবী) কন্যা দেবী আওয়াদকে তন্নোতমাতা হিসেবে পূজা করা হয়। প্রাচীনতম চারণ সাহিত্য অনুসারে, তন্নোত মাতা দেবী হিংলাজ মাতার অবতার। ৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভাট্টি রাজবংশের রাজারা নির্মাণ করেন তন্নোত মায়ের মন্দির। মায়ের পূজাপাঠ ও দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল ভাট্টি রাজবংশের রাজপুত রাজাদের। ১৯৬৫ সালে মন্দিরের দায়ভার নেয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ। ১৯৬৫ সালে আচমকাই এই অঞ্চল দিয়ে ভারতে আক্রমণ করে পাকিস্তান। কিষেনগড় ও সাদেদেওয়ালা সীমান্ত দিয়ে উপর্যুপরি আক্রমণ চালায় পাকিস্তান। গোলা এসে পড়ে তন্নোত মায়ের মন্দিরের আশেপাশে। ভারতীয় সেনাদের ছাউনি লক্ষ্য করে। কিন্তু পাকবাহিনীর নিক্ষেপ করা শেলগুলোর অধিকাংশই বিস্ফোরণ হয়নি। কোনো আজানা কারণে প্রায় সব শেলই অকেজ হয়ে যায়।

স্থানীয়দের বিশ্বাস এর আগের রাতেই গ্রামের মানুষজন এবং কয়েকজন জওয়ান স্বপ্নে দেখেছিলেন মা তন্নোত তাদের উদ্দেশে বলছেন, 'একটা খারাপ সময় আসছে। যদি তাঁরা মাকে ছেড়ে পালিয়ে না যায়, তবে স্বয়ং মা-ই তাঁদের রক্ষা করবেন'। ঘটনাচক্রে ঘটলোও তাই। এরপর থেকেই মন্দিরের দায়িত্ব নেয় বিএসএফ।

গাড়ি থেকে নেমে ধীরে ধীরে দাঁড়ালাম মন্দিরের সামনে। ভারতীয় সেনার গড়ে দেওয়া পাথরের মন্দির। গুরুদ্বারার মতো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। দেখলেই কেমন ভক্তিভাব জেগে ওঠে।

মন্দিরের এক পুরোহিত জানান, যে বহুকাল আগে মামাদিয়া চরণ নামে একজন এখানে বসবাস করতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। সন্তানলাভের আশায় তিনি সাত-আটবার পায়ে হেঁটে এখান থেকে অনেক দূরে এখনকার পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে অবস্থিত হিংলাজ মাতার মন্দিরে গেছিলেন। তারপর কোনও এক রাতে, হিংলাজমাতা স্বপ্নে মামাদিয়াকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী চাও—ছেলে না মেয়ে? চরণ বললেন, তুমিই আমার ঘরে জন্মগ্রহণ কর। হিংলাজমাতার কৃপায় চরণের সাত কন্যা ও এক পুত্রের জন্ম হয়। এর মধ্যে একজন ছিলেন আওয়াদ মাতা, যিনি তন্নোতমাতা নামেই বেশি পরিচিত। লোকশ্রুতি কিন্তু বহুকাল ধরেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এই গল্প বর্ণিত হয়ে চলেছে।

ইতিহাসের নথি অনুসারে তন্নোত মন্দিরটি ৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। স্থানীয় ভাট্টি বংশের রাজপুত রাজা তনু রাও এখানে তন্নোত মাতার মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই থেকে মন্দিরটিতে পূজার আয়োজনের ধারাবাহিকতায় কোনও ছেদ পড়েনি বলেই মানুষের বিশ্বাস। ইতিহাস ও লোকশ্রুতি নির্ভর তন্নোতমাতার মন্দিরে এইভাবেই চলে আসছিল নিয়মিত পূজার্চনা। ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের পর তান্নোতমাতার মন্দিরের আখ্যানে অকস্মাৎ যুক্ত হলো এক নতুন অধ্যায়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৬৫-র যুদ্ধে, ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল। পাকিস্তানের হাতে ছিল আমেরিকার কাছ থেকে পাওয়া আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র, যেগুলো আগের তুলনায় অনেক বেশি মারাত্মক। পাকিস্তানের গোলাগুলির জবাব দেওয়ার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনী এই সুবিধা নিয়ে সীমান্তের সাদেদেওয়ালা পোস্টের কাছে হামলা চালানো শুরু করে। সাদেওয়ালায় যুদ্ধরত ভারতীয় সেনাবাহিনীর জানা ছিল যে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। তবুও তারা জীবন বাজি রেখে মাতৃভূমি রক্ষার দায়িত্ব পালন করে। কিছুদিনের মধ্যেই তন্নোতমাতা মন্দিরের কাছেও গোলাগুলি শুরু হয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে গ্রেনেড ও বোমাগুলোর প্রতিটিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং একটিও বিস্ফোরিত হয়নি।

লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তিন হাজারেরও বেশি বোমা ফেললেও তন্নোতমাতার মন্দিরটি অক্ষত থেকে যায়। স্থানীয় আখ্যান অনুসারে, গ্রেনেডগুলো হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় বা ফাটেনি। তার মধ্যে থেকে পাঁচটি নিয়ে এসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আদি মন্দিরে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ১৯৭১-এ আবার ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের কাছে বিধ্বস্ত পাকিস্তান হঠাৎ করেই ৩ ডিসেম্বর রাজস্থানের কাছে পশ্চিমদিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দুটি ফ্রন্টে ব্যস্ত রাখার জন্য এই আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সাদেওয়ালা ততদিনে ভালোভাবে সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী লোঙ্গেওয়ালা এলাকা বেছে নেয়। মরুভুমির মধ্যে অবস্থিত লোঙ্গেওয়ালা চৌকির পাহারায় সেই সময় উপস্থিত মাত্র ১২০ জন জওয়ানের একটি কোম্পানি। ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান একটি পূর্ণ ব্যাটালিয়ন সৈন্য এবং ট্যাঙ্কের স্কোয়াড্রন নিয়ে লোঙ্গোয়ালা আক্রমণ করে। এদিকে সীমান্ত রক্ষায় তখন দুই কোম্পানি সেনা। বিগ্রেডিয়ার ই এন রামদাস, কর্নেল খুরশিদ হোসেন, মেজর আত্মা সিংহ, উইং কমান্ডার আর এস কাওয়াসজী প্রমুখের অসামান্য সাহসিকতায়, কমান্ডিং অফিসার কুলদীপ সিংহ চাঁদপুরীর নেতৃত্বে পঞ্জাব রেজিমেন্টের ২৩ ব্যাটেলিয়ান এবং ভৌর সিংহ প্রমুখের নেতৃত্বে বিএসএফের একটি কোম্পানি থার্টি ইনফেন্ট্রির অধীনে যে মরণপণ যুদ্ধ করে ভারত ভুখণ্ড অক্ষয় রেখেছিল তা লোকগাথায় পরিণত হয়েছে।

কেননা, পাকিস্তানের ট্যাঙ্কগুলো মরুভূমিতে বালির মধ্যে আটকে পড়ে। সেই সুযোগে ভারতীয় বিমানবাহিনী তাদের ধ্বংস করে দেয়। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ইতিহাসে লোঙ্গেওয়ালার লড়াই আজও স্মরণীয়। আজও লোঙ্গেওয়ালাকে বলা হয় পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক বাহিনীর কবরস্থান। আর এই অসম যুদ্ধ স্থান পেয়েছে পৃথিবীর অন্যতম রোমহর্ষক ও অবিস্মরণীয় যুদ্ধ হিসেবে। এই যুদ্ধ নিয়ে বলিউডের পরিচালক জেপি দত্ত তৈরি করেন সিনেমা 'বর্ডার'। বর্ডার ছিল জেপি দত্তের স্বপ্নের প্রকল্প। তিনি ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরে ছবিটির স্ক্রিপ্টের কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৯৬ সালের এপ্রিলে এটি সম্পূর্ণ হয়। ছবিটির বেশিরভাগ শুটিং হয়েছিল রাজস্থানের বিকানিরে। যোধপুরেও কিছু অংশের শুটিং হয়েছে। ১৯৯৭ সালের ১৩ জুন ছবিটি মুক্তি পায়। আজও স্বাধীনতা বা সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেখানো হয় এই ছবিটি।

ওই যুদ্ধেও তন্নোতমাতার মন্দিরের দিকে ছোড়া বোমা এবং গ্রেনেডের একটিও ফাটেনি। ফলে ১৯৭১-এর যুদ্ধের পরে, তন্নোতমাতার মাহাত্ম্য আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আজও লোঙ্গেওয়ালার সংগ্রহশালায় সযত্নে প্রদর্শিত হচ্ছে সেই যুদ্ধে পাকিস্তানের নিক্ষেপ করা না ফাটা শেলগুলোর খোল। স্থানীয়রা বলেন, এই যুদ্ধের প্রাক্কালে একইভাবে স্বপ্নে অভয় দিয়েছিলেন তন্নোতমাতা।

১৯৬৫-এর যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানকে পরাজিত করার পর, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) মন্দির চত্বরের কাছে একটি চৌকি স্থাপন করে তন্নোত মাতার পূজার দায়িত্ব নেয়। ১৯৭১-এর যুদ্ধের পর, ভারতের আদি মন্দির থেকে সামান্য দূরে বিশাল এলাকা জুড়ে স্থাপিত হয় তন্নোতমাতার নতুন মন্দির। মন্দির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে বিএসএফ। মূল মন্দিরের পাশে ছড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ চবুতরায় কালভৈরবের মূর্তি রয়েছে। স্থাপিত হয়েছে একটি সংগ্রহশালা। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য দুই যুদ্ধের না-ফাটা বোমা ও গ্রেনেড। এছাড়া ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিজয়ের স্মারক হিসেবে মন্দির প্রাঙ্গণের ভিতরে নির্মিত হয়েছে একটি বিজয়স্তম্ভ। প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহান বিজয়ের স্মরণে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। আর এভাবেই লোকের মুখে মুখে রচিত হয় নতুন লোককথা। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তন্নোতমাতার আলৌকিক কাহিনি। সময় যত এগিয়ে যায় ততই মাতৃমহিমার প্রচার প্রসারিত

হয়। সকাল ছ'টায় মন্দিরের দরজা খোলার পর থেকে রাত আটটায় বন্ধ হওয়া পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ভিড়ের কমতি নেই। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, মায়ের কাছে কিছু প্রার্থনা করলে মা অপূর্ণ রাখেন না।

সোনালি রঙের পাথরের মন্দিরটি রাজস্থানী শৈলীতে নির্মিত। মার্বেল পাথরের মেঝে। মন্দির প্রদক্ষিণ করার জন্য রয়েছে অলিন্দ। গর্ভগৃহে তন্নোতমাতার বিগ্রহ। তন্নোত মা দেবী দুর্গার প্রতিরূপ হলেও এখানে তিনি দশভুজা নন। তাঁর চারটি হাত। দেবীর সর্বাঙ্গ লাল চোলিতে মোড়া। মুখখানা দৃশ্যমান। সেই মুখটি মাতৃস্নেহে ভরপুর। মায়ের বিপরীতে শিবলিঙ্গ। আছে মা দুর্গা আর মা কালীর ছবি। মন্দিরের পাশেই পবিত্র কূপ। নবরাত্রির দিন ধুমধাম করে পূজা হয়। হাজার হাজার ভক্ত ভিড় করেন মন্দিরে। বিএসএফের তরফ থেকে লঙ্গরখানা খোলা হয়। ভক্তদের জন্য বিনামূল্যে খাওয়া এবং মেডিক্যাল ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করে বিএসএফ। এর কিছুটা পরেই ভারত-পাক সীমান্ত। যাকে আজও রক্ষা করে চলেছেন তন্নোতমাতার রূপে মা দুর্গা। □

ফ ঃ ৫

জি-২০ সম্মেলন : স্বাধীন ভারতের একটি যুগান্তকারী ঘটনা

ড. সুতনু সামন্ত

সদ্যসমাপ্ত জি-২০ সম্মেলন স্বাধীন ভারতে অনুষ্ঠিত একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশকারী নরেন্দ্র মোদীর (সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সফর চলাকালীন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীজীকে 'বস্' বলে উল্লেখ করেছেন) নেতৃত্বে ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লির ভারতমণ্ডপম সভাগৃহে জি-২০ সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। ১৯৯৯ সালে জি-২০ স্থাপিত হওয়ার পর এই প্রথম তার সম্মেলন এত সুচারু ও তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো। ২০২৪ সালে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, ভারত যে দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন করেছে তার ধারে কাছে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা বা ক্ষমতা কোনোটাই ব্রাজিলের নেই। জি-২০ সম্মেলনের দ্বারা ভারত কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। আলোচনা করার আগে জি-২০ কী এবং এর কাজ কী তা জেনে নেওয়া যাক।

জি-২০ হলো ১৯টি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী দেশ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন (দিল্লি অধিবেশনে মোদীজীর নেতৃত্বে আফ্রিকান ইউনিয়ন জি-২০-এর অন্তর্ভুক্ত হলো)-কে নিয়ে তৈরি একটি আন্তর্দেশীয় ফোরাম। ১৯৯৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত এই ফোরামের সদস্য দেশগুলি হলো : ভারত, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুর্কি, ইংল্যান্ড এবং ইউএসএ। জি-৭-এর পরে জি-২০ হলো অর্থনৈতিক দিক থেকে সব থেকে শক্তিশালী ফোরাম। এর কাজ হলো সদস্য দেশ-সহ সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতি, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং স্থায়ী উন্নয়নের বিষয়ে পর্যালোচনা, অর্থনীতি-সহ বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তার সমাধানসূত্র বের করে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে কোনো না কোনো সদস্য দেশে জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জি-২০ সম্মেলনে ভারতের প্রাপ্ত সাফল্য :

নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এক ব্যতিক্রমী ভাষণ হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভারতের সনাতন ঐতিহ্য 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর ভাবধারায় 'One Earth, One Family, One Future'-এর

আদর্শ তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে তা যত দ্রুত সম্ভব দূর করা, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সুষম আর্থিক বিকাশ, যুবক-যুবতীদের স্বপ্নপূরণ এবং পৃথিবীর জলবায়ু সংরক্ষণ।

আফ্রিকান ইউনিয়নের জি-২০-তে সংযুক্তি : ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ৫৫টি দেশের সংস্থা 'আফ্রিকান ইউনিয়ন'-কে জি-২০-তে অন্তর্ভুক্ত করা হলো দিল্লি সম্মেলনে। এর ফলে আফ্রিকার সব দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে উপকৃত হবে এবং চীনের বিআরআই-এর জাল থেকে রক্ষা পাবে। এই সংযুক্তির জন্য আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

নিউদিল্লি ডিক্লারেশন : এই সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে নিউদিল্লি ডিক্লারেশন গৃহীত হয়েছে এবং এটি জি-২০-র ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ও ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ঘোষণাপত্রে ১১২টি বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং এটিও একটি নজির সৃষ্টি করেছে। রাশিয়ার নাম না নিয়েই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বর্তমান সময় যুদ্ধের জন্য নয়। এই ঘোষণাপত্রে রাশিয়া নাম না উল্লেখ করা ভারতের কূটনৈতিক জয়। ভারতের জি-২০ শেরপা অমিতাভ কান্ত এবং বিদেশ দপ্তরের ৫ জন অফিসারের ২০০ ঘণ্টা নিরলস পরিশ্রমের ফসল হলো 'নিউদিল্লি ঘোষণাপত্র'।

ভারত-মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর : এই সম্মেলনের আরও একটি বড়ো সাফল্য হলো, ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর তৈরির বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ। এই করিডোর তৈরিতে ভারত, ইউএই, সৌদি আরব, জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সম্মত হয়েছে। এই করিডোর তৈরি হলে ভারত-সহ বিভিন্ন এশিয়ান দেশের উৎপাদিত দ্রব্য ইউএই, সৌদি, জর্ডন, ইজরায়েল হয়ে হাইফা বন্দর-হাইফা বন্দর থেকে সমুদ্রপথে গ্রিস এবং গ্রিস থেকে রেলপথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যাবে এবং বর্তমান বাণিজ্যপথের তুলনায় পরিবহণ খরচ ৪০ শতাংশ কম হবে, সময় অনেক কম লাগবে। এর ফলে ব্যবসার লাভ অনেক বেড়ে যাবে।

গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স : ফসিল ফুয়েলের পরিবর্তে বায়োফুয়েল (মূলত ইথানল)-এর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য অ্যালায়েন্স তৈরি হলো এই সম্মেলনে। এর সদস্য দেশগুলি হলো : ইউএসএ, ভারত, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইতালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউএই, বাংলাদেশ এবং মরিশাস। এই অ্যালায়েন্স-এর উদ্দেশ্য : বায়োফুয়েল তৈরি এবং ব্যবহারের জন্য যে প্রযুক্তি দরকার তা বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান করা।

ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকে তুলে ধরা : জি-২০ সম্মেলন হয়েছে নিউ দিল্লির প্রগতি ময়দানের কাছে নবনির্মিত 'ভারত মণ্ডপম'-এ। এই সভাগৃহের সামনে স্থাপন করা হয়েছে অষ্টধাতুর তৈরি বিশালাকায় নটরাজ মূর্তি, ভেতরে ছড়িয়ে রয়েছে সনাতন ঐতিহ্যের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন যার মধ্যে অন্যতম হলো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোনারক মন্দিরের সূর্যচক্র। কৃত্রিম মেধার (এআই) মাধ্যমে 'গীতাজ্ঞান' তুলে ধরা হয়েছে সম্মেলনে আগত ব্যক্তিবর্গের সামনে।

জি-২০ সম্মেলনের সফল ও সুচারু আয়োজন স্বাধীন ভারতের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। নিখুঁত ব্যবস্থাপনা, ভারতের অতিথিপরায়ণতা, আন্তরিকতা— সব কিছুই আগত ব্যক্তিবর্গকে মোহিত করেছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রতিনিধিরা ভারতের প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। জি-২০ সম্মেলনের মাধ্যমে সারা বিশ্ব এক 'নতুন উন্নত ভারত'কে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেল। ভারতবাসী হিসেবে আমরাও নতুন ভারতের ক্ষমতা দেখে গৌরবান্বিত হওয়ার সুযোগ পেলাম। এই সম্মেলনের ব্যাপক সাফল্য ভারতের 'সফ্ট পাওয়ার এবং ডিপ্লোমেটিক পাওয়ার'কে বহুগুণে বর্ধিত করতে সাহায্য করবে। ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতের রপ্তানি, ট্যুরিজম বাড়বে, নতুন নতুন বিদেশি কোম্পানির মাধ্যমে এফডিআই (Foreign Direct Investment)-এর আগমন ঘটবে ভারতের। এইসব প্রাপ্তি ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিরিখে এবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ‘কবিগুরুর শান্তিনিকেতন’

তিলক সেনগুপ্ত

সাধারণত কাজ শেষ হয়ে যাওয়া কোনও স্মৃতিস্তম্ভকে ‘হেরিটেজ’ তকমা দেওয়া হয়। বিশ্বে প্রথমবারের মতো, একটি লিভিং বিশ্ববিদ্যালয় ইউনেস্কোর দ্বারা ঐতিহ্যের তকমা পেল। সৌদি আরবের রিয়াধে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির বৈঠক হয়। ১০ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে বৈঠক, চলবে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেখানেই শান্তিনিকেতনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হলো। মাইক্রোব্লগিং সাইট ট্যুইটারে (সাবেক X-এ) এই ঘোষণা করে ইউনেস্কো। সেখানে লেখা হয়, ‘ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের তালিকায় নয়া সংযোজন— শান্তিনিকেতন। ভারতকে অভিনন্দন’। এই কাজের প্রথম উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে। কিন্তু বেশ খানিকটা এগিয়ে সেইবার পিছিয়ে আসতে হয়। ফের ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক ও শিক্ষামন্ত্রক যৌথ উদ্যোগে এই কাজে হাত দেয়। দায়িত্ব এসে পড়ে পুরাতত্ত্ব বিভাগের উপরে। তৎকালীন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কলকাতা মণ্ডলের অধীক্ষক শুভ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু হয়। তিনটি পর্বে ইউনেস্কোর নিয়ম অনুসারে প্রাথমিক ভাবে আবেদন জানায় ভারত সরকার। প্রথমটি শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর কোর এরিয়াকে পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে মান্যতা দেওয়া হবে। তার জন্য ১৯ পাতার ডিজিটাল ব্রোশিয়োর তৈরি করে এএসআই।

কীভাবে কী পদ্ধতিতে ঐতিহ্য স্থান তথা বাড়িগুলির সংরক্ষণ হচ্ছে তার বিবরণ ও ছবি সংবলিত ২৪ পাতার রিপোর্ট পাঠানো হয়। এবং একটি ভিডিয়ো ডকুমেন্টেশন পাঠানো হয় ইউনেস্কোর কাছে। প্রাথমিক ভাবে আবেদন গৃহীত হবার পর ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে প্রথম এসেছিল ইউনেস্কোর তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল। তাদের সামনে শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ভুলে ধরে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের স্বীকৃতি আদায়ে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বভারতী। সেজন্যই ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের নজরদারিতে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্য গৃহ, ভাস্কর্যগুলির আগেই সংস্কার শুরু করেছে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল শান্তিনিকেতনে এসে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের বিভিন্ন স্থাপত্য ও ঐতিহ্যবাহী জায়গা ঘুরে দেখেন।

ইউনেস্কো প্রতিনিধি দলের সফরের আগেই কেন্দ্র সরকারের নির্দেশ মতো শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রাঙ্গণে যেসব স্থাপত্য আছে, সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করেছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। ওই দপ্তরের কলকাতা মণ্ডলের সুপারেনটেন্ডেন্ট শুভ মজুমদারের তত্ত্বাবধানে ঐতিহ্যবাহী ‘উপাসনা গৃহে’, ঘণ্টা তলার সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের মুম্বাই মণ্ডলের অধিক্ষক শুভ মজুমদার বলেন, ‘একটা দীর্ঘ লড়াই ছিল এই স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে। বিশ্বভারতীর মধ্যে যে কোর আশ্রম এরিয়া রয়েছে তার ঐতিহ্য, প্রাচীন গুরুকুল পদ্ধতির ধারা আজও বহমানতা এই স্বীকৃতি আদায়ে সহযোগ দিয়েছে।’ প্রাথমিক অনুমোদন পর্বের পর এই প্রজেক্টের জন্য ডসিয়ার তৈরির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় দুই স্থপতিকে। তারা হলেন আভা লাম্বা ও মনীশ চক্রবর্তী। তারা দুজনে প্রায় ৩০০ পাতার ডসিয়ার তৈরি করেন। যা অন্তিম পর্বে ইউনেস্কোর দপ্তরে পাঠানো হয়।

অবশেষে এল সেই মহেন্দ্রযোগ। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেতে চলেছে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী। এই প্রথম বিশ্বের কোনো লিভিং বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমা পেল। ইউনেস্কোর তরফে মূলত সৌধ বা স্মৃতিস্তম্ভকেই হেরিটেজ তালিকায় রাখা হয়। এই প্রথম সক্রিয় অবস্থায় কোনও বিশ্ববিদ্যালয় সেই তালিকায় জায়গা পেল। খোলা আকাশের নীচে, মুক্ত বাতাসে শিক্ষাপ্রাপ্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আজও সেই প্রথা চলে আসছে শান্তিনিকেতনে। ডসিয়ার তৈরির দায়িত্বে থাকা সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্কিটেক্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মনীশ চক্রবর্তী বলেন, ‘এই স্বীকৃতি আসলে আজ থেকে ১০০ বছরেরও আগে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা দর্শন।’

এ বছর রবীন্দ্রজয়ন্তীতেই জানা যায়, ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের তরফে শান্তিনিকেতনের নাম সুপারিশ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রক এবং দেশের পরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের তরফে সেই মর্মে আবেদন জানানো হয়েছিল। □

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ভারতীয়রা। গুগল থেকে শুরু করে তাবড় আইটি কোম্পানিগুলোতেও ভারতীয় সিইও-দের দাপট। কলকাতার এক সাধারণ বাঙ্গালি মেয়ে থেকে সম্প্রীতি ভট্টাচার্য আজ হয়ে উঠেছেন অসাধারণ। এক অতি সাধারণ ছাত্রীর মতো তিনি পদার্থবিদ্যার পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন। পদার্থবিদ্যায় ফেল করলেও বিষয়টির প্রতি ভালোবাসা তাঁর একটুও কমেনি। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি যে অঙ্কে ভালো ছিলেন না, তাও নিজের সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন সম্প্রিতি। এমনকী তাঁর স্কুলের শিক্ষকরাও সেই সময়ে তাঁকে নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী ছিলেন না।

উড়ন্ত জলযানের স্রষ্টা বাঙ্গালি কন্যা

সাক্ষাৎকারে এই বাঙ্গালি কন্যা আরও জানান, ২০ বছর বয়সে তিনি ইন্টারনেটের সঙ্গে পরিচিত হন। ই-মেলের মাধ্যমে তিনি ৫৪০টি কোম্পানিতে ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু মাত্র ৪টি কোম্পানি থেকে তিনি ই-মেলের উত্তর পেয়েছিলেন। তার মধ্যে ফার্মিল্যাব নামে একটি কোম্পানিতে তিনি প্রথম ইন্টার্নশিপের সুযোগ পান। এরপরেই ভারত ছেড়ে ৮,০০০ মাইল দূরে শিকাগোতে পাড়ি দেন সম্প্রীতি। সেখানে একটি ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব সামলানোর পর তিনি ইন্টার্নশিপের সুযোগ পান নাসাতে। এরপর ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর এবং ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন তিনি।

পড়াশোনার পাঠ শেষ করে ১২ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করে সানফ্রান্সিসকোতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নিজের একটি টিম গঠন করে কাজ শুরু করেন তিনি। নিজেকে একজন এন্ট্রাপ্রেনিওর বা শিল্পোদ্যোগী হিসেবে সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করে ৩৬ বছরের সম্প্রীতি ভট্টাচার্য আজ নেভিয়ার নামক কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও। তাঁর নেতৃত্বে এই কোম্পানি আমেরিকায় প্রথমবারের জন্য একটি সুপারফাস্ট ইলেকট্রিক ফ্লাইং বোট তৈরি করেছে, যা মার্কিন জলযানের গতি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। এই কোম্পানির তৈরি ইলেকট্রিক ফ্লাইং বোট 'নেভিয়ার ৩০' বর্তমানে সামুদ্রিক শিল্পে বিপ্লব ঘটাচ্ছে। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম রেঞ্জ সহ এবং আমেরিকার প্রথম সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিন ফ্লাইং বোট বলে দাবি করা হয়েছে কোম্পানির তরফে।

নেভিয়ার নামে এই কোম্পানির তৈরি করা এই ফ্লাইং বোটটির ডিজাইন এমন ভাবে তৈরি যে জলের নীচে এর তিনটি উইংস (বা প্রপেলার) থাকে, সেগুলোর সাহায্যে জলতলের কিছুটা ওপরে ভেসে থাকে এই বোট। জলের ওপরে থাকার দরুন এটির স্পিড হয় অনেক বেশি, এই জলযান থাকে ঢেউয়ের প্রতিঘাতমুক্ত। ইলেকট্রিকাল বা ব্যাটারি চালিত হওয়ায় এই জলযান কার্বন নিঃসরণহীন, দূষণহীন, এবং ইঞ্জিন থেকে শব্দও নির্গত হয় না। এই উড়ন্ত জলযানে সমুদ্র সফরের অভিজ্ঞতা যেন জলের বুক চিরে এক বিমানযাত্রা। অনেক কম শক্তি ব্যবহারকারী এই ইলেকট্রিক বোট গ্যাসচালিত যে কোনো সাধারণ বোট অপেক্ষা ১০ গুণ বেশি কার্যক্ষম; জলপথ পরিবহণ নির্ভর অর্থনীতিতে যা এক নতুন যুগের সূচনা করতে চলেছে। এইখানেই থেমে না থেকে এই কোম্পানি ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয় বা সেল্ফ ড্রাইভিং বোট তৈরির পরিকল্পনাও করেছে যা জলপথকে একটি হাইওয়েতে পরিণত করে একটি দ্রুতগতির ট্যাক্সির রূপ নেবে।

এই সাক্ষাৎকারে সম্প্রীতি বলেন, "গত ১৩ বছরে আমি অনেক কিছু শিখেছি। কোনো পরমাণু চুল্লি ডিজাইন করা হোক বা ফ্লাইট কন্ট্রোল তৈরি, সব রকম চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার আত্মবিশ্বাস আমার রয়েছে। 'কঠোর অধ্যাবসায় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা আমেরিকা প্রবাসী বাঙ্গালি কন্যার এই আবিষ্কার সামুদ্রিক জলপথ পরিবহণে আনতে চলেছে এক বিপ্লব। সব বাধা জয় করে সাফল্যের পথে সম্প্রীতির এই উত্তরণ এই প্রজন্মের সব এন্ট্রাপ্রেনিওরদের কাছে অনুপ্রেরণার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। □

পঞ্চতন্ত্রের গল্প

নবাঙ্কুর

বুদ্ধিমানরা একবার দেখেই শেখে

একবার এক সিংহ, একটি গাধা আর একটি শেয়াল একসঙ্গে মিলে শিকার করতে গেল। যাবার সময় তারা ঠিক করল, একসঙ্গে শিকার করলে লাভ বেশি হবে। পরে শিকার শেষে তারা যে যার ভাগ বুঝে নেবে।

শিকার শেষ হলো। আজ ভালোমতোই প্রাপ্তিযোগ হয়েছে। সবাই বেশ খুশিমনে ফিরে এল। এবারে ভাগ করে নিয়ে খেলেই হবে।

সিংহকে গাধা ও শেয়াল বলল, আপনি আমাদের রাজা, আপনিই ভাগ করে দিন। আমরা আমাদের ভাগ বুঝে নিয়ে চলে যাই।

সিংহমশাই বলল, না, না, আমি এসবে নেই। তোমরাই ভাগ করো। এই বলে গাধাকে বলল, তুমি দেখো তো কীভাবে ভাগ করা যায়।

গাধা গদ গদ হয়ে যথা আজ্ঞে বলে ভাগ করতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে সমগ্র শিকারকে তিনটি সমান ভাগে ভাগ করে ফেলল। তার পর বলল, আমি সমানভাবে ভাগ করেছি আপনারা যে যার ভাগ বুঝে নিন।

সিংহমশাই তো রেগে আগুন। তিনি বরাবর বেশি অংশ পেয়ে অভ্যস্ত। সিংহভাগ কথাটি তো এজন্যই এসেছে। তাকে কিনা গাধাটা নিজের ও শেয়ালের সঙ্গে এক করে ফেলল!

সিংহ প্রচণ্ড রেগে এক থাবার আঘাতে গাধার মাথাটা ছিঁড়ে ফেলল। তারপর নখ দিয়ে তার শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। বেচারা গাধা! সে সমানভাবে ভাগ করায় কী অপরাধ হয়েছে তা বুঝতেও পারল না। বেঘোরে সিংহের হাতে প্রাণ হারাল।

এরপর সিংহ শেয়ালকে ডেকে বলল, ভাই শেয়াল, তুমি এবার ভাগ করে দাও। শেয়াল শুনে মিটিমিটি হাসল। সবাই জানে শেয়াল অতি বুদ্ধিমান জন্তু। শেয়াল তো আর গাধার মতো বোকা নয়। সে গাধার দশা দেখে বুঝতে পেরেছে সিংহের মনের আসল ইচ্ছা কী।

শেয়াল ভাগ করতে বসল। অতি সামান্য অংশ নিজের জন্য রেখে প্রায় সবটাই সিংহের জন্য রাখল। তারপর সিংহকে ডেকে বলল, মহারাজ, এবার আপনার অংশ আপনি আগে গ্রহণ করুন, তারপর যা থাকে সেটা আমি গ্রহণ করব।

সিংহ সব দেখে খুব খুশি হলো। বললল— বন্ধু, এত সুন্দর ভাগ করা তোমাকে কে শেখালো? তুমি একেবারে ঠিকঠাক ভাগ করেছ। কোথা থেকে এরকম শিক্ষা পেলে তুমি?

শেয়াল তখন হাসি চেপে বলল— মহারাজ, গাধার যে কী হাল হলো যে তো আমি নিজের চোখেই দেখলাম। অন্য কারও কাছে আর শেখার কিছু নেই। তার দশা দেখেই আমি বুঝলাম আপনার কাছে সমান ভাগের মানে কী?

ছোট্টো বন্ধুরা, বুদ্ধিমানরা একবার দেখেই শেখে। পরিস্থিতি অনুসারেই বিচার বিবেচনা করা জানতে হয়। ▫

বীর বনবাসী

তোগেন নেগমেইয়া সাংমা

মেঘালয়ের গারো পাহাড়ের এই জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামীর জন্ম তারিখ জানা যায়নি। ১৮৭২-৭৩ সালে যখন ইংরেজরা গারো পাহাড় দখল করার চেষ্টা করছিল তখন তোগেন সাংমা স্থানীয় গারো যুবকদের সংগঠিত করে ইংরেজদের মোকাবিলা করেন। তিনি স্থানীয় জনজাতি মানুষদের প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে লড়তে লড়তেই বীরগতি প্রাপ্ত হন। প্রতি বছর ১২ ডিসেম্বর তাঁর স্মৃতিতে গারো পাহাড়ে স্বাতন্ত্র্য সৈনিক দিবস পালন করা হয়।

জানো কি?

- সমুদ্রের গভীরতা মাপা যন্ত্রের নাম ফ্যাদোমিটার।
- ইসলামি দেশ ইন্দোনেশিয়ার ২০ হাজার টাকার নোটে ভগবান গণেশের ছবি আছে।
- ইজরায়েলের প্রত্যেক নাগরিক এক-একজন সৈনিক।
- ভুটানের জাতীয় পাখি দাঁড় কাক।
- মাত্র ৪০ মিনিটের রাত নরওয়ে দেশে।
- আগুন নেভানোর কাজে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
- নাইট্রাস অক্সাইডকে লাফিং গ্যাস বলা হয়।

ভালো কথা

আমার দুই বন্ধু

আমার দুটি বন্ধু । আমি সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসলেই বড়ো বড়ো মশা আমার পায়ে, কানে কামড়াতে থাকে। একটু পরেই ওরা হাজির হয়। একজন আমার পায়ের কাছের মশাগুলো খেতে থাকে। আবার দেওয়ালে উঠেও টপাটপ খেতে থাকে। আরেক বন্ধু মাথার উপর উড়তে উড়তে মশা খেতে থাকে। দশ মিনিটেই ঘরের মশা সাবাড়। প্রথম বন্ধুটি ঘরের মশা শেষ হলেও ঘরেই থেকে যায়। আমার ঘরেই ওর বাসা। অন্য বন্ধুটি কোথায় থাকে জানি না। জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে আসে। মশা খেয়ে আবার জানালা দিয়েই চলে যায়। আমার প্রথম বন্ধুটির নাম টিকটিকি। আর দ্বিতীয় বন্ধুটির নাম চামচিকা।

বিবেক সরদার, নবম শ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

পানকৌড়ি

সুজিত চৌধুরী, তৃতীয় শ্রেণী, নিশিন্দা, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

পানকৌড়ি খুবই কালো
তবু সে দেখতে ভালো।
সবাই বলে জলকাক
দেখতেও যেন দাঁড়কাক।
বড়ো মাছ ঠোঁটে ধরে
অনায়াসে সাবাড় করে।
বাংলাদেশের জেলেরা
পানকৌড়ি পোষে তারা।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

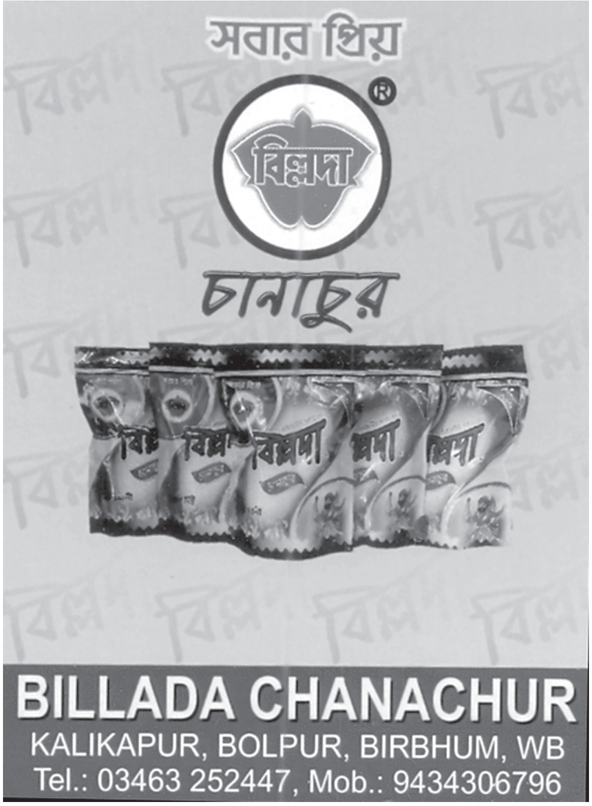

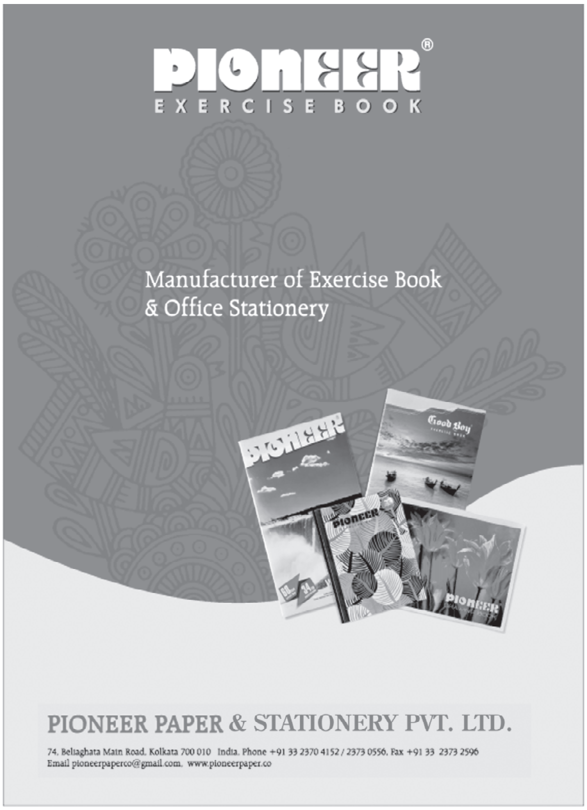

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

আড়াই বিঘা জমি শান্তিনিকেতনকে দান করলেন অরবিন্দ মুখার্জি

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে লন্ডনে বসবাসকারী অধ্যাপক ড. অরবিন্দ মুখার্জি এবং তাঁর স্ত্রী ড. ঋতা মুখার্জির বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে তাদের নিজস্ব আড়াইবিঘা জমি এবং ৭০০০ বর্গফুটের একটি বাড়ি ছিল। মুখার্জি পরিবার লন্ডনে বসবাস করেন। অরবিন্দবাবু তাঁর সেই সম্পত্তি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে দান করলেন। একটি ভিডিয়োতে দেখা গেছে মুখার্জি পরিবার দানপত্রে স্বাক্ষর করলেন এবং বললেন— 'আমি গুরুদেবকে আমার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলাম।'

আরও জানা গিয়েছে যে মুখার্জিবাবুর শান্তিনিকেতনের সীমান্তপল্লীতে 'পথের শেষে' নামক বাড়ি এবং আড়াই বিঘা জমির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকা।

বিশ্বভারতীর পক্ষে বলা হয়েছে, ১৯৫১ সাল থেকে এ পর্যন্ত এরকম বহুমূল্যের দান বিশ্বভারতী পায়নি। এমনকী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলেও নয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বলেছেন, অরবিন্দবাবু ১৯৫১ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিশ্বভারতীর পাঠভবনের ছাত্র ছিলেন। তারপর তিনি বিএসসি-তে স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে পড়তে যান। সেখানে তিনি অত্যন্ত ভালো রেজাল্ট করে সরাসরি পিএইচডি করেন। তাঁর বিষয় ছিল 'মেটেরিয়াল সাইন্স'। পরে সেখানে তিনি বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করেন। তাঁর মূল রোজগার ছিল, বিভিন্ন পেটেন্ট বিক্রি করে যে অর্থ তিনি পেতেন সেই অর্থ দিয়েই শান্তিনিকেতনের সম্পত্তি করেছেন। সে সময় অনেকেই তাঁকে বলেছিলেন, তিনি এই টাকায় লন্ডনেই একটি বাড়ি করুন। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমি দেশ থেকে যা পেয়েছি তা দেশকেই ফেরত দেব।'

উপাচার্য বিদ্যুৎবাবু অরবিন্দবাবুকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁর দানের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে আজকাল এরকম দান দেখাই যায় না।

অরবিন্দবাবু তাঁর প্রায় ছ'কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিশ্বভারতীকে দান করার পর যে আলোচনা শুরু হয়েছে তা হলো— একজন উদার মনস্ক মানুষ তাঁর বহুমূল্য সম্পত্তি যে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করলেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই সামান্য ১৩ শতক জমি অন্য একজন বিশ্ববিখ্যাত গুণী ব্যক্তি জোর করে দখল করে রয়েছেন। উপরন্তু তিনি প্রকাশ্যে জোর গলায় বলেছেন— 'বিশ্বভারতীর ১৩ শতক জমি আমি ফেরত দেব না।' ভাবুন একবার। দু'জনেই শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং দু'জনেই অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত। অথচ মানসিকতার তফাত কত বেশি। এই বিষয়টা সকলের জ্ঞাতার্থে আরও একবার জানাই।

নোবেল স্মারক পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনের পিতা

ফ ঃ ৬

আশুতোষ সেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বহুদিন আগে ১.২৫ একর জমি ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেন। সেই জমি তখন থেকেই অমর্ত্য সেনের দখলে রয়েছে এবং পরবর্তীতে তিনি সেখানে 'প্রতীচী' নামে একটি ট্রাস্ট স্থাপন করেন। এতদিন সেই জমি নিয়ে কোনো কথা ওঠেনি। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে বিশ্বভারতীর তথ্য ঘেঁটে জানা গিয়েছে অমর্ত্য সেনের পিতা ১.২৫ একর জমি লিজ নিলেও তাঁদের দখলে বিশ্বভারতীর ১.৩৮ একর জমি রয়েছে। এই তথ্য জানার পর বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিষয়টি অমর্ত্যবাবুকে জানান এবং উদ্‌বৃত্ত ১৩ শতক জমি বিশ্বভারতীকে ফেরত দিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যুৎবাবুর অনুরোধের পর যে ঘটনা ঘটেছে তা আর নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়। তবুও জানিয়ে রাখি--- বিদ্যুৎবাবু অমর্ত্যবাবুকে আরও অনুরোধ করেছিলেন— আসুন, আমরা একসঙ্গে আলোচনায় বসে উভয় পক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতিতে এবং উভয়পক্ষের আমিন দ্বারা আপনার লিজ নেওয়া জমিটা জরিপ করে দেখা হোক। তাতে যদি আপনার লিজের জমির পরিমাণ ১.২৫ একর জমির বেশি থেকে থাকে তাহলে উদবৃত্ত জমি ফেরত দিবেন এবং ১.২৫ একরের বেশি জমি আপনার দখলে না থাকলে ফেরতের কোনো প্রশ্নই নেই।' তাতে অমর্ত্যবাবু রাজি হননি এবং ঘটনাটি নিয়ে তিনি দেশ তোলপাড় করে ফেলেছেন। তাঁর তোলপাড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অমর্ত্যবাবুর 'প্রতীচী'-তে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন এই বলে যে— কেউ যেন তাঁর দখলীকৃত জমি দখল করতে না পারে তার জন্য স্থানীয় পুলিশকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া এ রাজ্যের কিছু বুদ্ধিজীবীও কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে অমর্ত্যবাবুর পক্ষ নিয়ে বিশ্বভারতীকে ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন।

স্বভাবতই গুঞ্জন শুরু হয়েছে এই বলে যে, অমর্ত্যবাবু নোবেল স্মারক পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং বিশ্ববন্দিত একজন অর্থনীতিবিদ। তাঁর জন্য দেশ গর্বিত। এরকম একজন গুণী ব্যক্তির কাছ থেকে দেশ, দেশের সরকার এবং দেশের জনগণ আশা করেন তিনি তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করবেন। কিন্তু তিনি যদি দেশের তথা তাঁর বাড়ির পাশের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামান্য ১৩ শতক জমি যা তিনি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন তার মোহ ত্যাগ করতে না পারেন তাহলে হতাশ হতে হয় বই কী।

তাঁর মতো বিখ্যাত ব্যক্তির আদর্শেই তো সাধারণ মানুষ অনুপ্রাণিত হবেন। কিন্তু তিনি সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেন না, সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আর একজন মানুষ যিনি আজ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিতে এবং দেশের অগণিত মানুষের কাছে 'দানবীর' হিসেবে স্বীকৃত হলেন।

অরবিন্দবাবুর সম্পত্তি দানের খবর জানার পর সামাজিক মাধ্যমে অভিনন্দনের ঝড় বয়ে গেছে। সেখানে অরবিন্দবাবুকে যেমন প্রশংসায় ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি অমর্ত্যবাবুকে তুলোধুনা করা হয়েছে। সকলের অবগতির জন্য সামাজিক মাধ্যমে করা কয়েকজনের মন্তব্য তুলে দিলাম।

১. 'এই জন্যই বাঁচতে ইচ্ছে করে এমন মানুষ আছেন বলে, সেনবাবুকে কেউই মনে রাখবেন না।'

২. 'যিনি মানুষের কাছে বরেণ্য হতে পারতেন, তিনি মানুষের মনে বিস্মৃতির অতল গভীরে হারিয়ে গেলেন, শুধু নিজের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য।'

৩. 'বহুদিন পর একটা ভালো খবর শোনা গেল। ঈশ্বর পরিত্যক্ত এই রাজ্যে শুধু অনাচার ও দুর্নীতির কথা শুনতে শুনতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আজ এই মন ভালো করা খবর আমাদের এই রাজ্যের মরুভূমির বুকে ক্ষণকালের জন্য হলেও যেন একটা শীতল হাওয়া বইয়ে দিক।'

৪. 'আসল শিক্ষা কাকে বলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শ্রীঅরবিন্দ মুখার্জি ও তাঁর স্ত্রী। পুঁথিগত শিক্ষা আর বিরাট বিরাট ডিগ্রি থাকলেই সৎ ও ভালো মানুষ হওয়া যায় না।'

৫. 'রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত/উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।' এই অরবিন্দবাবু সত্যিই উজ্জ্বল রডোডেনড্রন ফুলের মতো আমাদের এই দুর্দিনে এই অবক্ষয়ের সময়ে একটু আলো দিয়ে গেলেন। সাধু, সাধু।'

৬. 'উনি যা দান করলেন সেটা তো অনেক অনেক বড়ো কিন্তু তার চেয়েও বড়ো মনে হয় উনি যা বললেন— 'গুরুদেবকে পুষ্পাঞ্জলি।' সত্যিকারের মানুষের দৃষ্টান্ত। তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি।'

৭. 'অমর্ত্য সেন হয়তো চেষ্টা করলে হওয়া যায় কিন্তু অরবিন্দ মুখার্জি হওয়া আজকের দুনিয়ায় শুধু অসম্ভবই নয়, নামুমকিন। অনেক অনেক প্রণাম রইলো আপনাদের সবাইকে।'

৮. 'এত চোরদের কথার মাঝে এক টুকরো মনুষ্যত্বের দেখা পেয়ে আবার আত্মবিশ্বাসের দোলায় দুলে উঠলাম।'

৯. 'আসলে আধারটাই আসল। শিক্ষাগত যোগ্যতা যতই থাকুক, আধারের পার্থক্য মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে দেয়। তাঁদের পুরো পরিবারকেই নমস্কার জানাই। ভালো থাকবেন।'

১০. শিক্ষা ও মানসিকতা দুটি ভিন্ন। নোবেল বিজয়ীমানেই যে উচ্চমানের ব্যক্তি হবে এর কোনো ভিত্তি নেই। শিক্ষা হলো পুঁথিগত, মানবিকতা বা মনুষ্যত্ব বংশগত বৈশিষ্ট্য। দুই ব্যক্তির তফাৎ এখানেই।'

অরবিন্দবাবু তাঁর বহু মূল্যবান সম্পদ কবিগুরুকে 'পুষ্পাঞ্জলি' দিয়ে একজন 'দানবীর' আখ্যা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা দেশবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আগামী দিনগুলি তিনি যেন সুখে এবং শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারেন। তিনি নোবেল পুরস্কার না পেয়েও প্রমাণ করে গেলেন, মানসিকতাই বড়ো কথা। □

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন এবং ভারতের বিদেশ নীতির ভবিষ্যৎ গতিপথ : একটি পর্যালোচনা

বিমলশঙ্কর নন্দ

ভারতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত নানা মহলে ছিল নানা প্রশ্ন, আশা ও অনিশ্চয়তার নানাবিধ দোলাচল। কেউ কেউ তো এই ধরনের সম্মেলন এদেশে করার ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলছিলেন। ভারতের মতো 'গরিব' দেশ এত খরচ করে কেনই-বা এই ধরনের সম্মেলন করছে! এত খরচ করে ভারতের লাভই-বা কী। তার বদলে ওই অর্থ দেশের দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন কল্পে ব্যয় করলে তা নাকি অনেক মানবিক হতো। এই সম্মেলনের জন্য দিল্লি শহরের হকারদের নাকি অবর্ণনীয় দুর্দশার মুখোমুখী হতে হয়েছে। দিল্লি বিমানবন্দর থেকে সম্মেলনস্থল পর্যন্ত রাস্তার কাছাকাছি সব বস্তি, ঝুপড়ি নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ৯-১০ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপম আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে জি-২০-এর অষ্টাদশ সভা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এই কণ্ঠগুলো এখন অনেক ক্ষীণ। যারা আন্তর্জাতিক রাজনীতি কিংবা ভারতের বিদেশ নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে অধিক আগ্রহী তাঁরা আগামীতে ভারতের বিদেশনীতির ওপর, ভারতের আন্তর্জাতিক ভূমিকার ওপর জি-২০ সম্মেলনের কী প্রভাব পড়বে তা জানতে বেশি আগ্রহী। কোনো হতাশাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে ভারতের আন্তর্জাতিক ভূমিকা ও বিদেশনীতির ওপর জি-২০ সম্মেলনের প্রভাব সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

জি-২০ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালে এশীয় আর্থিক সংকটের ঠিক পরেই। এশীয় আর্থিক সংকটের সূত্রপাত ঘটে ১৯৯৭ সালে। এই সংকট প্রথম আঘাত হানে থাইল্যান্ডে যা 'টোম ইয়াম কুং' সংকট বলে পরিচিত। ১৯৯৭ সালের ২ জুলাই থাইল্যান্ডের মুদ্রা ভাট-এর দামে ধস নামে। এর পর প্রভাব পড়ে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, লাওস, হংকং, ফিলিপিনস্, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের ওপর। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের দ্রুত হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এই সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তিগুলি একজোট হয়ে ভবিষ্যতের কোনো সংকট আটকানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ অনুভব করে। গড়ে ওঠে জি-২০ (জি অর্থে গ্রুপ বা গোষ্ঠী), যা প্রথমে ছিল অর্থমন্ত্রী এবং সেন্ট্রাল ব্যাংকের গভর্নরদের সমন্বয়ে গঠিত একটি গোষ্ঠী। জি-২০-তে আছে ১৯টি দেশ এবং তার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ২০০৮ সাল থেকে এর সদস্যদেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা এই সম্মেলনে যোগ দেওয়া শুরু করেন। ফলে এর অর্থনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি রাজনৈতিক গুরুত্বও বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। সমষ্টিগতভাবে জি-২০-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি পৃথিবীর মোট জাতীয় উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ, পৃথিবীর মোট বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এই দেশগুলিতে বাস করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশগুলিই এই গোষ্ঠীর অঙ্গীভূত। তাই অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই এই গোষ্ঠীর গুরুত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর ভারত জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছিল। ২০২৩-এর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত এই গোষ্ঠীর সভাপতি পদে আসীন থাকবে। ২০২২ সালে ভারত যখন জি-২০-এর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হয় সেই সময় গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট ক্রমে জটিল আকার ধারণ করছিল। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া ইউক্রেনের ওপর আক্রমণ চললে বিশ্বজোড়া রাজনৈতিক সংকটের সূত্রপাত হয়। এর প্রভাব পড়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে। কারণ তেলের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহযোগী দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক সহযোগিতা থেকে রাশিয়াকে বাইরে রাখতে উদ্যোগী হয়। চীন রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছিল। এর প্রভাব পড়েছিল জি-২০-এর ওপরেও। জি-২০-এর অভ্যন্তরীণ ফাটল ক্রমেই চওড়া হচ্ছিল। এই গোষ্ঠীর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল।

এই সংকটকালীন সময়ে ভারত এই গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিশ্বজোড়া আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। ভারতের

প্রথম দায়িত্ব ছিল জি-২০-এর ফাটলটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করা, ভিন্নমতের মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ করা। ভারতকে এমন কিছু নীতি তৈরি করতে হতো যেগুলিতে সব দেশ একমত হতে পারে। বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকটের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রভৃতিকে নিয়ে রোডম্যাপ তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। জি-২০-এর মধ্যেই আছে চীনের মতো দেশ, যার রাজনৈতিক ও আর্থিক নীতিসমূহ প্রায়শই বিশ্বজুড়ে বিতর্কের বাতাবরণ তৈরি করছে। চীনের মোকাবিলায় বদ্ধপরিকর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সহযোগী দেশগুলি পালটা ব্যবস্থা নিচ্ছে। ভারত নিজেই তার বিস্তীর্ণ সীমান্তে চীনা আগ্রাসনের মোকাবিলা করছে। তার পরেও ভারতের দায়িত্ব ছিল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে একটি ভারসাম্যমূলক নীতি প্রণনয়নের চেষ্টা করা। এছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সঙ্গত এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং বৈশ্বিক খাদ্য ও শক্তি সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়গুলিও ছিল ভারতের অগ্রাধিকারের তালিকায়।

৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর জি-২০-এর নতুন দিল্লি শীর্ষ সম্মেলনের পর এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণে অবদান রাখার যে অনন্য সুযোগ ভারতের সামনে এসেছিল ভারত তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। উন্নীত হয়েছে বিশ্বমঞ্চে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকায়। ভারতকে বিশ্বগুরুতে পরিণত করার যে স্বপ্ন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী দেখে চলেছেন তা সফল হওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। নতুন দিল্লির শীর্ষ সম্মেলনের পর জি-২০ আর আগের মতো থাকবে না। অনেকটাই বদলাবে এই সংগঠন। বদলাবে ভারতের বিদেশ নীতি এবং তার আন্তর্জাতিক ভূমিকাও। এই সম্মেলনের মাধ্যমে ভারত তার বৃহৎ কূটনীতিকে পরিচালনা করার ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গত বছরের বালি (ইন্দোনেশিয়া) সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্যের কারণে কোনো ঐকমত্য হয়নি। ফলে সর্বসম্মত কোনো ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এবারে শীর্ষ সম্মেলন শেষ হওয়ার আগেই একটি সর্বসম্মত ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করে ফেলা হয়। বিশ্বের বর্তমান সংকটকালীন সময়ে ভারতীয় কূটনীতির এ এক অসামান্য সাফল্য।

গত ন' বছর ভারতের নেতারূপে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী আন্তর্জাতিক ভূমিকার ক্ষেত্রে নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঞ্চার ঘটিয়েছেন। এতদিন তাঁর দ্বিপাক্ষিক কূটনীতির ধরন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জি-২০-এর মতো বৃহৎ একটি বিশ্বমঞ্চে ভারত নিজেই এক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারতকে আর উদীয়মান শক্তির ভাবনার মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। এটা এমন এক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ঘটেছে সেখানে বৃহৎ শক্তিগুলি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষমতার ভারসাম্য দ্রুত বদলাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৯০-৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন পর্যন্ত সময়কালকে বলা হতো ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল। তখন দুই মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরের সঙ্গে তীব্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। যদিও দুই পরমাণু শক্তিধর দেশ কখনোই পরস্পরের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি।

যুদ্ধহীন যুদ্ধের এই অবস্থানকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির তাত্ত্বিকরা ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবস্থা বলে চিহ্নিত করেন। ১৯৯০-১৯৯১ সময়কালে সমাজতন্ত্রের অবলুপ্তি, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের সংকট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাঙন ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান এবং বিশ্বজোড়া দ্বিমেরুকেন্দ্রিক শক্তিসাম্য ব্যবস্থার পতন সূচনা করে। বিশ্ব প্রবেশ করে একমেরুকেন্দ্রিক ব্যবস্থায়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে বিশ্ব রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্ক এক নতুন ঠাণ্ডা যুদ্ধের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই সময়ে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে মতৈক্যের ভিত্তিতে যে দিল্লি ঘোষণাপত্রের সাফল্য ভারতকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বিশ্বরাজনীতিতে সাম্প্রতিক সংকট সমাধানে প্রয়োজন ছিল এমন এক নেতৃত্বের যার প্রচেষ্টাকে সবাই গুরুত্ব দেবে, যার মতকে সবাই গ্রহণ করার কথা ভাববে। এতদিন এই জায়গাটা শূন্য ছিল। সেই শূন্যতা পূরণে ভরত দ্রুত সক্রিয়তা দেখিয়েছে এবং জি-২০-এর সভাপতিত্বকে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করেছে।

আর একটি কারণে জি-২০-তে ভারতের নেতৃত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তীব্র মেরুকরণের এই সম্ভাবনার সময়ে ভারত তথাকথিত গ্লোবাল সাউথের দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্বজোড়া উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নির্মাণ করেছে। বিশ্ব রাজনীতির কাঠামোকে একক চেষ্টায় বদলে দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু নিজস্ব আন্তর্জাতিক কর্মসূচি সামনে তুলে ধরে তাকে একটা স্থিতিশীল ব্যবস্থায় আনা সম্ভব। ভারত সেটাই করেছে সাফল্যের সঙ্গে। আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-এর অন্তর্ভুক্ত করে এই আন্তর্জাতিক মঞ্চটিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রাসঙ্গিক করা হয়েছে।

বাস্তবে জি-২০ এখন জি-২১। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের ভূমিকা কী হবে সে নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন ছিল। অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল এবারেও হয়তো জি-২০ কোনো সর্বজনীন ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করতে পারবে না। কিন্তু ভারতের দীর্ঘকালীন অবস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জি-২০ ঘোষণাপত্রে দেশগুলিকে আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতা, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা-সহ আন্তর্জাতিক আইনকে সংরক্ষিত ও সমুন্নত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। এভাবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত এক সেতুবন্ধনকারী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নতুন দিল্লি সম্মেলনের আগে জি-২০-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক প্রশ্ন, অনেক সংশয় ছিল। নতুন দিল্লি শীর্ষ সম্মেলনের পর এক নতুন জি-২০ আবির্ভূত হয়েছে। জি-২১ হওয়ার পর আগামীতে তা আরও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে, এটা আশা করা যায়। নতুন দিল্লি শীর্ষ সম্মেলনের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছে এক নতুন বিশ্বশক্তি যার ক্ষমতা ও ভূমিকা সকলের স্বীকৃতি পেয়েছে। তার নাম ভারতবর্ষ। □

জ্ঞানবাপী থেকে পাওয়া পুরাতাত্ত্বিক নমুনা জমা দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার সময়ে হিন্দু মন্দির সম্পর্কিত যে ঐতিহাসিক নমুনাগুলি জ্ঞানবাপী মসজিদে পাওয়া গেছে সেগুলি জেলাশাসককে হস্তান্তর করার জন্য বারাণসী জেলা আদালতের তরফে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর আদালত বলেছে এই মামলার দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দু ধর্ম উপাসনা পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্কিত যে উপকরণগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি হস্তান্তর করতে হবে জেলাশাসকের কাছে এবং সেগুলি জেলাশাসকের কাছেই সুরক্ষিত থাকবে। আদালত চাইলে সেগুলো আদালতে উপস্থিত করতে হবে।

হিন্দুদের দাবি, বারাণসীর প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের প্রাঙ্গণেই তৈরি করা হয়েছিল জ্ঞানবাপী মসজিদ। কিছুদিন আগে বারাণসীর কয়েকজন হিন্দু মহিলা মসজিদের দেওয়ালে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে জানিয়ে উপাসনার অধিকার দাবি করে মামলা করেছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে সেই মামলার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ। সেই মামলার শুনানির আগেই এই নির্দেশ দিল বারাণসী জেলা আদালত। মহিলা আবেদনকারীদের দাবির ভিত্তিতে ২০২১ সালে এক আইনজীবীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল দিয়েছিল বারাণসী জেলা আদালত। জেলা আদালতের সেই রায় বহাল রেখেছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। তবে হাইকোর্ট জানিয়েছিল কোনো খোঁড়াখুঁড়ি সেখানে করা যাবে না। হাইকোর্ট আরও জানিয়ে দেয়,

বারাণসীর এক নিম্ন আদালত। এলাহাবাদ হাইকোর্টে সেই রায়কেও চ্যালেঞ্জ করেছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ।

১৭ শতকে এই জ্ঞানবাপী মসজিদ তৈরি হয়। তার আগে ওই স্থানে কোনো মন্দির ছিল কিনা তা যাচাই করার জন্য এএসআইকে মসজিদ চত্বরে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার নির্দেশ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় হিন্দু-মুসলিম উভয়কেই ন্যায় বিচার পেতে সুবিধা হবে। হাইকোর্টের নির্দেশে জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা শুরু করেছে এএসআই। মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা সম্পূর্ণ করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য গত ৮ সেপ্টেম্বর এএসআইকে আরও চার সপ্তাহ সময় দিয়েছে আদালত।

মিশরে নিষিদ্ধ হলো নিকাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১১ সেপ্টেম্বর মিশরের শিক্ষামন্ত্রী রেডা হেগাজি স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের ব্যবহৃত মুখ ঢাকা বস্ত্র নিকাব পরিধান নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। স্কুল ছাত্রীদের হেডস্কার্ফ ব্যবহারে তাদের ব্যক্তিগত অধিকারের উল্লেখ করলেও, স্কুলে তাদের মুখ না ঢাকার বিষয়ে তিনি বিশেষ জোর দেন। তিনি বলেন যে এই ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অভিভাবকরা তাদের ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়ে সচেতন থাকেন, এবং ছাত্রীদের ওপর তাদের কোনো রকম ইচ্ছে যেন চাপিয়ে না দেন। আরবীয় ভাষা, ধর্মশিক্ষা, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের শিক্ষকরা মন্ত্রকের এই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের লক্ষ্যে ছাত্রীদের সহায়তা করবেন। বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম মহিলারা ধর্মীয় কারণে নিকাব পরিধান করে থাকেন। কট্টরপন্থীদের দাবি মিশরের সংবিধান ধর্মীয় স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। নিকাব নিষিদ্ধ হওয়াটা নাগরিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ। প্রসঙ্গত, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে নিকাব নিষিদ্ধ করার পর ২০২০ সালে মিশরের আদালত সেই নির্দেশ বহাল রাখে। মিশরের একাধিক সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিকাব নিষিদ্ধ করেছে। ভারতে কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধীরা হিজাব-নিকাবের পক্ষেই কথা বলে চলেছেন।

লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ১৮ সেপ্টেম্বর মন্ত্রীসভায় যে বিশেষ বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী, তাতে মহিলা সংরক্ষণ বিল সংক্রান্ত আলোচনা হয়। এরপর বিলটি পেশ করার ব্যাপারে অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। ১৯ সেপ্টেম্বর সংসদের অধিবেশনের আলোচ্য সূচিতে পরে 'সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট অব বিজনেস'-এ ১২৮তম সংবিধান সংশোধনী বিল হিসাবে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি পেশ

করা হবে বলে জানানো হয়। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল লোকসভায় (নারীশক্তি বন্ধন অধিনিয়ম) বিলটি পেশ করেন। বিল পেশের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'নারী সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের প্রতিটি প্রকল্পই নারী নেতৃত্ব গঠনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রতিটি দেশের উন্নয়ন যাত্রায় এমন মাইলফলক আসে, যখন গর্বের সঙ্গে বলতে হয়, আজ আমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম ভাষণে আমি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস ও গর্বের সঙ্গে বলছি, আজকের মুহূর্ত, আজকের দিনটি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হতে চলেছে। বহু বছর ধরে নারী সংরক্ষণ নিয়ে অনেক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো এই সংক্রান্ত বিল আনা হয়। কিন্তু নানা কারণে সেই বিল কার্যকর হয়নি। অবশেষে মন্ত্রীসভা মহিলা সংরক্ষণ বিল অনুমোদন করেছে। সেই কারণে ১৯ সেপ্টেম্বরের এই তারিখটি ইতিহাসে অমরত্ব পেতে চলেছে। আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটি শুরু করতে যাচ্ছি যে, সমস্ত সংসদ সদস্যদের একত্রিত হয়ে দেশের নারীশক্তির জন্য নতুন প্রবেশদ্বার উন্মোচন করতে হবে'। সেউ সূত্রে এই বিল পাশ করার জন্য প্রত্যেকটি দলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী যে বিল পেশ করেছেন তাতে হলা হয়েছে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আগামী ১৫ বছরের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভায় আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'সীমাবদ্ধ অনুশালন' চালু হচ্ছে। এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, জনগণনা শেষ হওয়ার পর ২০২৬-'২৭ সালে ডিলিমিটেশন অর্থাৎ দেশজুড়ে প্রতিটি লোকসভা আসন পুনর্গঠিত হবে। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই বিলটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা। নতুন সংসদ ভবনের প্রথম অধিবেশনে ইতিহাস সৃষ্টি হলো।

পাক অধিকৃত কাশ্মীর সংক্রান্ত ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতের সঙ্গে মিশে যাবে অধিকৃত কাশ্মীর, সেদিন খুব দূরে নয়। রাজস্থানের দৌসায় এক সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, ভারতের প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল ভিকে সিংহ বলেন অধিকৃত কাশ্মীর নিজে থেকেই ভারতে যুক্ত হবে। আমাদের শুধু একটু অপেক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত, ভারতের অংশ হতে চেয়ে সম্প্রতি পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিক্ষোভ তীব্র হয়েছে। সেখানে পাক সরকারের তরফে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সিন্ধু নদের উপনদীগুলির ওপরে পাক সরকারের তরফে বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মিত হলেও বিদ্যুৎ সেখানে অগ্নিমূল্য। চলছে টানা লোডশেডিং। সীমান্ত খুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে অধিকৃত কাশ্মীরের শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ও। ওই ঘটনার জেরে এই দাবি তুলেছেন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ভিকে সিংহ। অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বরাবরই রাষ্ট্রপুঞ্জে সোচ্চার হয়েছে ভারত। চলতি বছরের মে মাসে গোয়ার এসসিও গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন পাক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। তার সামনেই জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে তহবিল জোগানের জন্য পাকিস্তানের কড়া সমালোচনা করেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তবে শুধু পাকিস্তান নয়, চীনা আগ্রাসন নিয়েও মুখ খোলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ভিকে সিংহ। তিনি বলেন, মানচিত্রে ভারতের অরুণাচল প্রদেশ ও আকসাই চীনকে নিজেদের এলাকা বলে বেজিং দাবি করলেও এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ এটা চীনের পুরনো অভ্যাস। শুধুমাত্র ভারতের ম্যাপ প্রকাশ করে তারা কিছু করতে পারবে না। এতে কিছু বদলাবে না। কোন্ এলাকাগুলি আমাদের, ভারত সরকার তা স্পষ্ট করে দিয়েছে। অবান্তর দাবি করলেই ভারতের এলাকা চীনের হয়ে যায় না।

কমিউনিস্ট বিচারধারা থেকে বিশ্বকে মুক্ত করতে হবে: মোহন ভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদের নামে কমিউনিস্টরা বিশ্বজুড়ে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালাচ্ছেন। এর উল্লেখ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বলেন, এই হুমকি ও সন্ত্রাস থেকে বিশ্বকে মুক্ত করার দায়িত্ব ভারতের। 'দ্য লেফট্ টার্মাইট দ্যাট ডিস্ট্র্যাক্ট দ্য ওয়ার্ল্ড' নামে একটি বইয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রীভাগবত বলেন, 'বামপন্থীরা সারা বিশ্বে ধর্মীয় জীবনধারার বিরুদ্ধে। সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদের নামে বামপন্থীরা ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং সারা বিশ্বে, বিশেষ করে পশ্চিমি দেশগুলোতে তারা ধ্বংসযজ্ঞ শুরু চালিয়েছে। কমিউনিস্ট দর্শনের নামে সমাজে ভুল ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা এখনো করে করেছে। এতে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে এবং মানুষ পশুত্বের দিকে ঝুঁকছে। এই সংকট পশ্চিমি জগতেও প্রভাব ফেলছে। এ শুধু সমাজের বহিরঙ্গে নয়, ঘরে ঘরে পৌঁছচ্ছে। সেজন্য ভারতীয় সমাজকে আরও সতর্ক হতে হবে'।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা আজ যে সংগ্রামের সাক্ষী হচ্ছি, তা নতুন নয়। এ শুধু দেবতা ও অসুরদের মধ্যে লড়াইয়ের এক নতুন রূপ। এই সংকট থেকে বিশ্বকে বাঁচানোর ক্ষমতা ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিরন্তন মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত। সমাজের উচিত, কমিউনিস্টদের পরাজিত করতে সত্য, করুণা, আতিথ্য ও তেজের চারটি নীতি গ্রহণ করা। আমাদের চিরন্তন মূল্যবোধ নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত। ঐতিহাসিক কাল থেকে ভারত সফলভাবে এই ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয়েছে এবং এই সংকট হজম করার ক্ষমতাও ভারতীয় সমাজের রয়েছে। শাশ্বত মূল্যবোধকে ধারণ করে সমগ্র সমাজ এই কাজ করতে পারে। সেজন্য সব ভাষায় এরকম অনেক বই প্রকাশ করা উচিত। আমাদের মূল্যবোধ, আমাদের চিন্তাধারা প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া উচিত। পাশাপাশি অন্যান্য উপায়েও তা করতে হবে। এটা কোনও প্রতিষ্ঠানের একার কাজ নয়, পুরো সমাজের দায়িত্ব'। গত ১৭ সেপ্টেম্বর পুনায় 'দ্য লেফট টারমাইট দ্যাট ডিস্ট্র্যাক্ট দ্য ওয়ার্ল্ড' পুস্তকের প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি কথাগুলি বলেন।

সরসঙ্ঘচালকের মতে, 'সাংস্কৃতিক কমিউনিজমের এই পন্থা অবৈজ্ঞানিক। বামপন্থা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। বামপন্থী মানসিকতা ও বিচারধারার মানুষ মনে করে, তারা নিজেরা সর্বশক্তিমান। বামপন্থীরা নিজেদের ভগবান মনে করে। নিজেদের বৈজ্ঞানিক ভাবে। আসলে তা নয়। বামপন্থী সিস্টেম সমাজের অনেক গভীরে হামলা চালিয়েছে। বামপন্থীরা গোটা বিশ্বে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এটা আমাদের সংস্কৃতির ওপর হামলা। মার্ক্সবাদের নাম করে ওরা ভুল আদর্শ ও সিদ্ধান্তের প্রচার করে চলেছে, যা সমাজের ক্ষতি করছে সমাজের একজন সদস্য হওয়ার কারণে আমাদের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। বামপন্থীরা তাদের ধারণা প্রচারের পাশাপাশি তাদের মত প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি শক্তিশালী বাতাবরণও তৈরি করছে। সঠিক ও আদর্শগতভাবে এই বামপন্থীদের জবাব দেওয়ার জন্য আমাদেরও একটি শক্তিশালী বাতাবরণ গড়ে তুলতে হবে। বিশ্বের সামনে আমাদের চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ উপস্থাপন করার সময়ে আমাদের ভয় পাওয়া উচিত নয়'। ডিএমকে নেতা উদয়ানিধি স্ট্যালিনের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রসঙ্গে মোহনজী বলেন, 'সনাতন ধর্মকে সঠিক স্থানে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমরা সকলে সনাতন সংস্কৃতির পক্ষে'।

বাংলাদেশে নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়নের তাম্বুলখানা বাজার সর্বজনীন কালী ও দুর্গা মন্দিরের নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে ভাঙচুর করেছে দুষ্কৃতীরা। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দায়ীদের গ্রেপ্তার দাবি করেছেন তাঁরা।

সংগঠনের তিনজন সভাপতি ঊষাতন তালুকদার, অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক ও নির্মল রোজারিও এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রাণা দাশগুপ্ত এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রতি বছর শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রস্তুতিকালে সারা দেশজুড়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিমা ভাঙার ঘটনা ঘটেই চলেছে। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার কোনও বিচার এ যাবৎকালে না হওয়ার ফলে এ ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিবৃতিতে নেতারা বলেন, ফরিদপুরের ওই একই মন্দিরে ২০২১ সালেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ওই সময়ও দুর্গাপূজার প্রস্তুতিকালে ওই মন্দিরে নির্মীয়মাণ দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়। সেই সময় দিদার নামে এক দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে দেওয়া হয়। কিন্তু ওই দিদারকে মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে দেখিয়ে ১৫ দিনের মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই সময় যদি ওই দুষ্কৃতীর যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো তাহলে আজকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো না। বিবৃতিতে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিমা ভাঙচুরের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে তারা জানান।

তাম্বুলখানা বাজার সর্বজনীন কালী ও দুর্গা মন্দিরে প্রতিমা ভাঙচুরের স্থান পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ফরিদপুর জেলা নেতারা। সংগঠনের জেলা আহ্বায়ক ভবতোষ বসু রায়, ফরিদপুর পৌর শাখার সভাপতি সুমন দে বাবু ও সাধারণ সম্পাদক অপু সাহার নেতৃত্বে সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে যান। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির সভাপতি প্রফুল্ল সরকার ও সাধারণ সম্পাদক ভবেশ চন্দ্র দাস। নেতারা পুলিশ কর্মকর্তা-সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের পরপর কয়েকটি দিনের কথা মনে পড়লে এখনও গা শিউরে ওঠে। উত্তর ও মধ্য কলকাতার পথঘাট ভেসে গিয়েছিল নিরীহ হিন্দুদের রক্তে। সেই সময় হিন্দুদের পরিত্রাতা রূপে যিনি পথে নেমেছিলেন, তাঁর নাম গোপাল মুখার্জি। পারিবারিক সূত্রে পাঁঠার মাংসের দোকান ছিল বলে লোকে তাঁর পদবির জায়গায় 'পাঠা' বলত। সেই অদম্য সাহসী হিন্দু রক্ষাকারী মানুষটির জীবনের উপর আলোকপাত করেছেন **নারায়ণ চক্রবর্তী** তাঁর লেখায়— **ইতিহাসের উপেক্ষিত নায়ক**।

বর্তমান ভারতে 'হিন্দুত্ব' শব্দটি বহুচর্চিত। সেই সূত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রসঙ্গটিও। আর এই 'হিন্দুত্ব' শব্দটি গ্রন্থের শিরোনাম হিসেবে সর্বপ্রথম যিনি বিদ্বজ্জন সমাজে তুলে ধরেন সেই চন্দ্রনাথ বসুর জীবন ও সমাজ ভাবনা নিয়ে লেখা--- **'হিন্দুত্ব : চন্দ্রনাথ বসু ও আর এস এস'। লিখেছেন— বিজয় আঢ্য।**

সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই শুভ-অশুভ , দেব অসুরের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নানান রূপে আজও প্রবহমান। মাতৃপূজার এই শুভ লগ্নে অসুরদলনী দেবী দুর্গার সেই অতুলনীয় বৈচিত্র্যময় এক রূপের কাহিনি ফুটিয়ে তুলেছেন **প্রবাল** তাঁর লেখা— **'অথ ত্রিলিঙ্গ কথা...'** য়।

প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে গান্ধীহত্যার ঘটনায় যুক্ত করার চক্রান্তের দিক উন্মোচন করেছেন বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও সাংবাদিক **সুজিত রায়** তাঁর রচনা— **নাথুরামের বিচার ঃ এক অন্তহীন কোর্টরুম ড্রামা'য়।**

আরও যাঁরা লিখেছেন—

দেবী প্রসঙ্গ
ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস
এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

পুরাণ কথা
নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প
সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে,
দেবদাস কুণ্ডু, সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জোশী,
ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী , ড. পঙ্কজ কুমার রায়

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা